PRESERVATION OF HEALTH

IN

BENGALI

BY

RADHIKA PRASANNA MUKHERJEA.

SIXTH EDITION.

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S. PRESS,
113, AMHERST STREET.

1869.

মূল্য আট আনা।

PRESERVATION OF HEALTH

IN

BENGALI

BY

RADHIKA PRASANNA MUKHERJEA.

SIXTH EDITION

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

শ্রীরাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত।

ষষ্ঠ সংস্করণ।

CALCUTTA:

PRINTED AT J. G. CHATTERJEA & CO'S PRESS.

115, AMHERST STREET.

1869

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

স্কুল সমূহের প্রধানতম ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এইচ্ উড্রো এম, এ, মহোদয়ের অনুমতি লইয়া আমি এই গ্রন্থ সঙ্কলন করিতে প্রবৃত্ত হই। সঙ্কলনবিষয়ে উক্ত মহাত্মার নিকট সবিশেষ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

অনবকাশ বশতঃ গ্রন্থখানি সর্ব্ব প্রকার দোষ-শূন্য করিয়া তুলিতে পারিলাম না। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি সাধারণের বোধগম্য করিবার প্রয়াসে সরল ভাষায় লিখিতে চেষ্টা পাইয়াছি। এই পুস্তক স্কুলের ছাত্রদিগের পাঠ্য হইবে বলিয়া ইহাতে বিবাহ প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সন্নিবেশিত হইল না। স্বাস্থ্য-রক্ষা অতি কঠিন বিষয়; ইহার সমুদায় নিয়ম একত্র করিতে গেলে, গ্রন্থের আকার বৃহৎ হইয়া উঠিবে, এই আশঙ্কায় কতিপয় সাধারণ নিয়ম মাত্র সঙ্কলিত হইল।

এক্ষণে পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন এই, কোন স্থানে ভ্রম লক্ষিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন। দ্বিতীয়বার মুদ্রাঙ্কনকালে কৃতজ্ঞচিত্তে তাহা সংশোধন করিয়া দিব।

আমার পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় চৌধুরী-কৃত "নরদেহ নির্ণয়" গ্রন্থ হইতে অনেক শব্দ গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা
১০ই জানুয়ারি।
১৮৬৪।

ষষ্ঠবারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল এই পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণ মুদ্রিত হয়। তৎকাল হইতে ইহার কোন কোন ভাগ পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলাম কিন্তু সাংসারিক নানা অসুখ ও অনবকাশ বশতঃ সংপূর্ণরূপে সংকল্প সাধন করিতে পারি নাই। যাহা হউক পুস্তকের কিয়দংশ নূতন করিয়া লিখিয়াছি ও ইহাতে কয়েকটী নূতন প্রয়োজনীয় চিত্র দেওয়া হইয়াছে। এবার যেরূপ ব্যয় ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পুস্তক সংশোধন ও পরিবর্দ্ধন করিলাম তাহাতে পাঠকগণের পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক উপকার হইলে শ্রম সফল হইবে। মাসত্রয় হইল পূর্ব্বমুদ্রিত পুস্তক নিঃশেষিত হওয়াতে গ্রাহকগণের অনুরোধে কিছু তাড়াতাড়ি করিয়া মুদ্রিত করিতে হইল। এক্ষণে বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ ইহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি রাখিলে অনুগৃহীত হইব। ইতি ২০ আশ্বিন। ১২৭৬ সাল।

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

উপক্রমণিকা।

আমাদের দেশ জ্বর, ওলাউঠা প্রভৃতি ভয়ানক রোগের আবাসভূমি হইয়া উঠিয়াছে। কএক বৎসরের মধ্যে কতশত গ্রাম এককালে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এবং এক্ষণেও নানা স্থান পীড়ার আতিশয্য বশতঃ বাসের অযোগ্য হইয়া যাইতেছে। কিন্তু কি কি কারণে এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিতেছে ও কি উপায়েই বা তাহাদের প্রতিবিধান হয়, তদ্বিষয়ে অনেকেই ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভৌতিক ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে যে আমাদিগকে রোগগ্রস্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়, তাহা অনেকেই বুঝেন না; কেহ কেহ অল্প পরিমাণে বুঝিয়াও অভ্যাস ও অবস্থাদোষে নিয়ম পালন করিয়া উঠিতে পারেন না। অনেকে বিবেচনা করেন, আমরা ঈশ্বরের কোপানলে পতিত হইয়াছি বলিয়াই এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি; কেহ কেহ বলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কোন নিয়ম প্রতিপালন না করিয়াও স্বচ্ছন্দ শরীরে দীর্ঘায়ু হইয়া কালযাপন করিয়া গিয়াছেন,

উপক্রমণিকা।

আমরা কেন নিয়মাধীন হইব? এরূপ তর্ক ভ্রম-সঙ্কুল বলিতে হইবে। অতি-ভোজন, দুর্গন্ধময় বায়ু-সেবন, অপরিষ্কৃত ও আর্দ্র গৃহে বাস, অতিশয় শীত বা রৌদ্র-ভোগ প্রভৃতি অন্যায় আচরণ করিলে, শরীরে কোন না কোন প্রকার অসুখ হইবেই হইবে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের দণ্ড কখনই না হইবার নহে। সুস্থ ও দৃঢ়কায় ব্যক্তি যে মারীভয়াক্রান্ত স্থানে অল্পক্ষণমাত্র অবস্থিতি করিয়া অচিকিৎস্য রোগ-গ্রস্ত হইয়াছেন, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে সকল নিয়ম পালন ও যেরূপ শারীরিক ও বৈষয়িক ব্যাপারে কালাতিপাত করিতেন এক্ষণে তাহার অনেক নাই। অবস্থা-ভেদে ও দেশা-চারের পরিবর্ত্তন-ক্রমে সকল বিষয়েরই প্রভেদ হইয়া যাইতেছে। অতএব যে যে নিয়ম পালন করিয়া চলিলে স্বাস্থ্য-রক্ষা হয়, তাহা জানা সকলেরই কর্ত্তব্য। কএক খান প্রসিদ্ধ ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য-রক্ষোপযোগী কতক গুলি নিয়ম সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগের কিঞ্চিৎ উপকার হইলে আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

বর্ত্তমান কালে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যেরূপ অনিশ্চিত অবস্থা দেখা যাইতেছে, তাহাতে প্রায় কোন চিকিৎসকের হস্তেই শরীর সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায়

না। অনেকেই অনুপযুক্ত ও অপরিমিত ঔষধ দিয়া নানা প্রকার নূতন রোগের সূত্রপাত করিয়া দেন। এতদ্দেশে যে প্রাচীন চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহার অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়াছে; ডাক্তারদিগের মধ্যেও নানা প্রকার মতভেদ দেখা যাইতেছে, ঔষধ ব্যবস্থা করিবার সময় চিকিৎসকদিগের পরস্পরের অনৈক্য দেখা যায়। একে পীড়াই ক্লেশকর, তাহাতে আবার এরূপ চিকিৎসকদিগের হস্তে পতিত হওয়া ততোধিক বিড়ম্বনার বিষয়। অতএব যাহাতে পীড়ার হস্তে পতিত হইতে না হয়, তদ্বিষয়ে সকলের ই যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য।

এই পুস্তকে যে সকল ভৌতিক পদার্থের উল্লেখ করা হইবে এস্থলে অতি সংক্ষেপে তাহাদের বিবরণ লেখা যাইতেছে।

পৃথিবীতে যে সমস্ত জড় পদার্থ আছে তৎ-সমুদায়ই পরমাণুর সমষ্টি। পরমাণুর আকার অতি সূক্ষ্ম। মনুষ্যেরা এ কাল পর্য্যন্ত যে কোন উপায়ে কোন বস্তুকে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করিয়াছেন, তাহাতে আদি পরমাণু প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। পরমাণু আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর, এমন কি অণুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

পরমাণু সমুদায় এক জাতীয় নহে। এক এক পদার্থের পরমাণ এক এক প্রকার। রাসায়ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডি-

উপক্রমণিকা।

ভেরা ৬৪ প্রকার * ভিন্ন ভিন্ন ভৌতিক পদার্থের উল্লেখ করিয়া থাকেন, ইহাদের প্রত্যেকই পৃথক্ পৃথক্ প্রকৃতির পরমাণু সমষ্টি। ইহাদের মধ্যে ৪৯টীকে ধাতু বলা যায়, এবং অবশিষ্ট ১৫টী কে উপধাতু বলা যাইতে পারে।

উপধাতু কএকটীর নাম নিম্নে লিখিত হইল।

বাঙ্গালা নাম।			ইংরাজি নাম।
১ অম্লজান	..	..	অক্সিজেন্
২ উদজান	...	...	হাইড্রোজেন্
৩ যবক্ষার-জান		..	নাইট্রোজেন্
৪ গন্ধক	...	..	সল্‌ফর্
৫ ..	..	...	সেলেনিয়ম
৬ ..	...	...	টেলুরিয়ম
৭ ..	..	...	ক্লোরাইন্
৮ ...	...	..	ব্রোমাইন্
৯ ..	..	..	আইয়োডাইন্
১০ ...	..	..	ফ্লুয়োরাইন্
১১	..	..	ফস্‌ফরস্
১২ সেঁকো	..	..	আরসেনিক্
১৩ ..	..	..	বোরন্
১৪ ..	...	...	সিলিকন্
১৫ অঙ্গার	..	....	কার্বন্

* আমাদের প্রাচীনমতে পাঁচটী মাত্র ভৌতিক পদার্থের উল্লেখ ছিল, "ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ"। ইহাদের মধ্যে তেজঃ ও আকাশ পদার্থই নয়, ক্ষিতি, জল ও বায়ু মিশ্র পদার্থ।

৪৯ টী ধাতুর মধ্যে বিশুদ্ধ ধাতু মাত্রেই ভৌতিক পদার্থ। আমাদের দেশে তাহার মধ্যে কএকটী মাত্র ব্যবহৃত হয়। যথা স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, পারদ, ইত্যাদি। ধাতুসমূহের রাসায়নিক কার্য্য এপুস্তকে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। উপধাতু কএকটীর বিষয় কিছু লেখা আবশ্যক।

উপধাতু সমূহের মধ্যে অম্লজান উদজান, যবক্ষার-জান ও অঙ্গার আমাদের ইন্দ্রিয়-গোচর অনেক কার্য্যে লাগে। এজন্য ইহাদেরই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতে হইবে। কিন্তু যে ৬৪টী ভৌতিক পদার্থের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের পরস্পরের পরমাণু সকল বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে মিলিত হইয়া, পৃথিবীস্থ সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছে। দুই বা অধিক জাতীয় পরমাণু রাসায়নিক নিয়মে মিলিত হইলে তাহাদের পূর্ব্ব প্রকৃতি থাকে না, তখন নূতন গুণ বিশিষ্ট স্বতন্ত্র পদার্থ হইয়া উঠে। গন্ধক ও পারার রাসায়নিক সংযোগ হইলে হিঙ্গুল প্রস্তুত হয়। হিঙ্গুল তখন একটী নূতন পদার্থ বলিয়া অনুভূত হয়। অন্যান্য পদার্থেরও এইরূপ ঘটে।

ভৌতিক পদার্থের মধ্যে অম্লজান, উদজান, যবক্ষার-জান প্রভৃতি কএকটী অমিশ্র অবস্থায় বাষ্পীয় আকারে থাকে, এ পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোন উপায়ে তরল বা কঠিন করা যায় নাই। পারদ প্রভৃতি সচরাচর তরল অবস্থায় থাকে, অল্প তাপ সংযোগ করিলেই বাষ্পাকারে

পরিণত হয়, এবং শীতল পদার্থ সংযোগে কঠিন হইয়া উঠে। অবশিষ্ট কএকটী সচরাচর কঠিন অবস্থাতেই থাকে, যেমন গন্ধক, দস্তা, সীস। ইহাদিগকে তাপ সংযোগ দ্বারা তরল ও বাষ্পীয় অবস্থায় আনা যাইতে পারে।

অম্লজান বাষ্প সংযোগে ভূপৃষ্ঠস্থ অধিকাংশ রাসায়নিক কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পদার্থটী অন্যান্য পদার্থ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। বায়ু রাশির ১/৫, জলরাশির ৮/৯, এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দ্রব্যের অন্যূন ১/২ অংশ অম্লজান। যে সকল পদার্থে অম্লরস আছে, তৎ সমুদায়ে অম্লজান আছে ইহা দেখিয়া পূর্ব্বতন পণ্ডিতেরা ইহার নাম অম্লজান রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিতেন যে এই বাষ্প সংযোগেই অম্লরস উৎপন্ন হয়। কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে, যে অম্লজান ব্যতীত কোন কোন তীব্র অম্লরস বিশিষ্ট দ্রাবক প্রস্তুত হয়। বরং উদজানের অংশ না থাকিলে কোন অম্লরস দ্রব্য উৎপন্ন হয় না।

উদজান বাষ্প অম্লজানের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী নহে, জলের ১/৯ অংশ উদজান, ইহা ব্যতীত জল উৎপন্ন হয় না বলিয়া ইহার নাম উদজান হইয়াছে। জল ভিন্ন অন্য পদার্থেও উদজান প্রাপ্ত হওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ ও জন্তুগণের শরীরে, ও জলীয় বাষ্পে, উদজান বিদ্যমান আছে।

যবক্ষারজান প্রধানতঃ বায়ুরাশিতেই প্রাপ্ত হওয়া

যায়। বায়ুর প্রায় ই অংশ এই বাষ্প। এতদ্ভিন্ন এমো-নিয়া প্রভৃতি কয়েকটী পদার্থে এবং অনেক উদ্ভিজ্জে ও জন্তুগণের শরীরে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যবক্ষারে এই পদার্থ আছে বলিয়া ইহার নাম যবক্ষার-জান হইয়াছে।

অঙ্গার কঠিন পদার্থ। আমরা সচরাচর কাষ্ঠখণ্ড দাহন করিয়াই অঙ্গার প্রস্তুত করিয়া থাকি। এতদ্ভিন্ন পাথরিয়া কয়লাও এক প্রকার অঙ্গার। পশু দিগের অস্থি দাহন করিয়াও অঙ্গার প্রস্তুত করা যায়। কিন্তু এই সকল প্রকার অঙ্গারেই নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে। হীরক প্রভৃতি পদার্থই প্রকৃত বিশুদ্ধ অঙ্গারের উদাহরণ স্থল।

যে স্থানে বায়ুর সমাগম আছে, তথায় অঙ্গার দাহন করিলে, অম্লজান বাষ্পযোগে উহা হইতে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প প্রস্তুত হয়। ইহার দুই ভাগ অম্লজান ও একভাগ অঙ্গার।

১০০ ভাগ বিশুদ্ধ বায়ুতে প্রায় ৭৯ ভাগ যবক্ষার জান ও ২১ ভাগ অম্লজান বাষ্প আছে। এতদ্ভিন্ন অল্প পরি-মাণে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্পও ইহাতে মিশ্রিত আছে। ৫০০০ ভাগ বায়ুতে প্রায় ২ ভাগ এই বাষ্প। আমোনিয়া প্রভৃতি কয়েকটী বাষ্পও বায়ুতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইহাদের পরিমাণ এত অল্প যে অঙ্কদ্বারা নির্দ্দেশ করা কঠিন। আমোনিয়া তিন ভাগ উদজান ও একভাগ যবক্ষার-জানের মিলনে উৎপন্ন।

বিশুদ্ধ জল ও জলীয় বাষ্প উদজান, ও অম্লজানের

মিলনে উৎপন্ন। ইহার ৮ ভাগ অম্লজান এবং ১ ভাগ উদজান।

অম্লজানের সহিত নিয়তই অনেক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগ হইতেছে। অঙ্গার, উদজান, ও যবক্ষারজান যে কোন পদার্থে থাকুক না কেন, অম্লজানের সহিত তাহাদের এরূপ সম্বন্ধ যে তাহার সংযোগ হইবা মাত্র রূপান্তর ধারণ করে। উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর নিয়তই অম্লজান যোগে পরিবর্ত্তন-শীল রহিয়াছে। জীব ও উদ্ভিজ্জের জীবন শেষ হইলে, তাহার যে অংশ বায়ুস্থিত অম্লজানের সংসর্গে আইসে সেই অংশের উদজান, বায়ুস্থ অম্লজান যোগে জলরূপে পরিণত হয়। ঐ অংশের অঙ্গারের ভাগ অম্লজানযোগে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প হইয়া যায়। এবং এই সকল প্রক্রিয়া কালে শরীরের কিয়দংশের যবক্ষার-জান ও উদজান মিলিয়া আমোনিয়ার রূপ ধারণ করিয়া বায়ুতে মিলিত হয়। অস্থি প্রভৃতি কঠিন অংশও ক্রমে ক্রমে রূপান্তর ধারণ করিয়া মৃত্তিকার সহিত মিলিয়া যায়।

কাষ্ঠ দাহনকালেও ঐরূপ দেখা যায়। অম্লজান-যোগে কাষ্ঠস্থ অঙ্গারের ভাগ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়, উদজানের অংশ জলরূপে পরিণত হয়, এবং অবশিষ্টাংশ ভস্মরূপে পড়িয়া থাকে।

আমাদের চতুর্দ্দিগে অম্লজান বাষ্পযোগে যে সকল রাসায়নিক কার্য্য নিরন্তর হইতেছে, তৎসমুদায়ের সহকারে তাপ উদ্ভাবন হইয়া থাকে। উদ্ভিজ্জ ও জীব শরীর যখন

পচিয়া যায়, অর্থাৎ যৎকালে তাহাদের উপর অম্লজান বাষ্পের কার্য্য আরম্ভ হয়, তখন প্রতি নিয়ত অল্প অল্প করিয়া তাপ উদ্ভাবিত হইয়া থাকে। সেইরূপ যখন কোন জন্তু নিশ্বাস দ্বারা বায়ুগ্রহণ করে, বায়ুস্থিত অম্লজান বাষ্প শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া, স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে, রাসায়নিক কার্য্য করিতে থাকে, সুতরাং সেই কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাপও উদ্ভাবিত হয়।

LIST OF BOOKS REFERRED TO.

Apjohn's Mettalloids.

Miller's Chemistry.

Carpenter's Human Physiology.

Draper's Human Physiology.

Johnston's Physiological charts and handbooks.

Lewe's Physiology of common Life.

Lardner's Animal Physiology.

Maun's Manual of Physiology.

Combe's principles of Physiology.

Fowler's Physiology.

Cassell's Health and Physiology.

Orr's Physiology.

La Mert's Science of Life.

Chambers' Preservation of Health.

Jacques' Hints to Physical perfection.

Millar on Alcohol.

Westminister Review, new series vol.

Social science and Sanitary Review, June 1[illegible].

&c. &c. &c.

Weale's Series " Management of Health."

Hugeland's Art of prolonging Life.

স্বাস্থ্য-রক্ষা।

প্রথম অধ্যায়।

শারীর ক্রিয়া।

মনুষ্যের জীবন রক্ষার জন্য তিন প্রকার ক্রিয়া প্রয়োজন। বায়ু, জল, ও খাদ্য দ্বারা এই তিন প্রকার কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। নিশ্বসন, জলপান, ও আহার গ্রহণ জীবন রক্ষার অনুল্লঙ্ঘনীয় নিয়ম। কয়েক মিনিট নিশ্বসন, কয়েক দণ্ড জলপান, বা কয়েক দিন আহার গ্রহণে বিরত থাকিলে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়।

আমাদের প্রয়োজনানুসারে, এই তিনটী ক্রিয়ার উপযোগী পদার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিশ্বসন কার্য্যে বিলম্ব সহেনা, এজন্য বায়ুরাশি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল পিপাসা সহ্য করিতে পারি, এজন্য কেবল স্থানে স্থানে জলাশয়

দেখা যায়। কিন্তু আহার বিনা কয়েক দিন বাঁচিতে পারি বলিয়া, ইহা সংগ্রহ করা অনেক পরিশ্রম সাধ্য। খাদ্য আহরণ চেষ্টায়, পৃথিবীর অনেক লোকই পরিশ্রম করিয়া বেড়াইতেছে।

জল, বায়ু ও খাদ্যের প্রয়োজন কি? কি নিমিত্তই আমরা এই তিনের অভাব সহ্য করিতে পারি না? ক্ষুধার কারণ কি, আহার দ্বারাই বা কিরূপে তাহার শান্তি হয়, ও শান্তি না হইলে কি জন্য শরীর ক্ষয় ও মৃত্যু হইয়া থাকে?

জীবগণের শরীর ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং সেই ক্ষতি পূরণ করিবারও উপযুক্ত উপায় নির্দ্ধারিত আছে। শ্বাস প্রশ্বাস স্বেদনির্গম প্রভৃতি যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা আমরা জীবিত থাকি; হস্তপদ সঞ্চালন, চক্ষুরুন্মীলন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আমাদের অশেষবিধ সুখের আকর, বুদ্ধিশক্তির চালনা প্রভৃতি যে সকল কার্য্যে, আমাদিগের মন অনুক্ষণ ব্যাপৃত থাকে, তৎসমুদায় দ্বারাই শরীরের অংশ-বিশেষ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমরা আহার দ্বারা এই ক্ষতি পূরণ করিয়া থাকি।

যখন এইরূপ ক্ষতিপূরণের প্রয়োজন হয়, তখন স্বভাবতঃ ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আহার গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। ভুক্তদ্রব্য শরীরের অভ্যন্তরে কিয়ৎকাল থাকিয়া প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা রক্তরূপে পরিণত হয়। সেই রক্ত দেহের, সর্ব্বস্থানে সঞ্চরণ করিয়া যে অংশের

ক্ষয় হইয়াছে তাহা পূরণ করিয়া দেয় ; যদি আহার গ্রহণ করা না হয়, অথবা ভুক্তদ্রব্য শরীরের ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত না হয়, তাহা হইলে শরীর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। ডাক্তারেরা স্থির করিয়াছেন এইরূপে শরীরের ⅖ অংশ ক্ষয় না হইতে হইতেই প্রাণবিয়োগ হয়।

শরীর,—অস্থি, মাংস, চর্ম্ম প্রভৃতি পদার্থে গঠিত। বাহিরের আচ্ছাদন চর্ম্ম, তৎপরে মাংস, ও সর্ব্বশেষে অস্থি। অস্থিদ্বারা শরীরের আকার ও গঠন নির্দ্দিষ্ট হয়, ও অস্থিময় কঙ্কালের অন্তর্গত স্থানে পাকযন্ত্র প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যক যন্ত্র সকল অবস্থিত। অস্থি দৃঢ় পদার্থ বলিয়া আমরা ভার বহন কবিতে সমর্থ হই, আমাদের মধ্যেও যাহাদের অস্থি অপেক্ষাকৃত কোমল তাহারা ভার বহনে অসমর্থ। দেখ, শিশুরা অন্য ভারের কথা দূরে থাকুক আপন শরীরের ভার বহন করিতে পারে না। ক্ষমতার অতিরিক্ত ভার গ্রহণ করিলে অস্থি ভগ্ন হইয়া যায়। বোধ করি অনেকেই মনুষ্য বা অন্য কোন বৃহৎকায় জীবের কঙ্কাল দেখিয়া থাকিবেন, এজন্য এস্থলে তাহার প্রতিকৃতি দেওয়া হইল না।

অস্থিময় জীবকঙ্কাল শুদ্ধ চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে, তদ্দ্বারা গমনাগমন প্রভৃতি কোন কার্য্যই হইতে পারিত না। অস্থিসকল কাহার বলে সঞ্চালিত হইবে? শরীরনির্ম্মাতা এই অভাব নিরাকরণ জন্য মাংসপেশী দ্বারা অস্থি সকল সম্বদ্ধ রাখিয়াছেন। এই সকল পেশী

অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রধান সাধন। এক এক পেশী নানা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মাংসসূত্রের সমষ্টি। পেশীসমূহ আবশ্যক মতে সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই অঙ্গচালনা হইয়া থাকে।

পেশীগুলি অস্থিতে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ। শরীরের গ্রন্থি-স্থলে পেশীর দুই প্রান্ত দুই দিগের অস্থিতে সংলগ্ন। পেশী সঙ্কুচিত হইলে, ইহার আয়তন হ্রস্ব হয়, সুতরাং পেশীসংলগ্ন অস্থিগুলির সঞ্চালন হইয়া থাকে।

সঞ্চালনকালে অস্থিদ্বয় ঘৃষ্ট হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এই অনিষ্ট নিবারণার্থ তাহাদের যোড়ের মুখ অপেক্ষাকৃত কোমল অস্থিদ্বারা আবৃত। এই কোমল অস্থিকে উপাস্থি বলা যাইতে পারে। উপাস্থির গায়ে এক প্রকার তৈলময় পদার্থ প্রতিনিয়ত সঞ্চিত হয়। যেমন গাড়ির চাকায় তেল দিলে তাহার ঘর্ষণ নিবারণ হয়, সেইরূপ উপাস্থি সকল তৈলযুক্ত থাকাতে ঘর্ষণকালে ক্লেশিত হয় না। ক্রমে ক্রমে অধিক সঞ্চালিত হইলে পেশী সকল বর্দ্ধিত ও বলিষ্ঠ হয়। হস্তপদ প্রভৃতি স্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছানুসারে চালিত হয়, ইহা-দিগকে ইচ্ছানুগ পেশী বলা যায়। হৃদয় পাকযন্ত্র প্রভৃতি স্থানের পেশী আমাদের ইচ্ছায়ত্ত নহে, ইহাদিগকে স্বৈর পেশী কহে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, আমাদের মনে অঙ্গ-চালনার ইচ্ছা হইলে শরীরের দূরবর্ত্তী অংশ সকল কিরূপে সঞ্চালিত হয়? মনের সহিত অঙ্গ বিশেষের কিরূপ

সম্বন্ধ সংস্থাপিত আছে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমতঃ স্বীকার করিতে হয়, আমাদের মস্তিষ্ক মনের যন্ত্র-স্বরূপ। মস্তিষ্ক দ্বারাই শরীর ও মনের সম্বন্ধ নিরূপিত আছে। মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুরজ্জু হইতে শরীরের সকল স্থানে স্নায়ু নামক অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তার ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এই সকল স্নায়ু মনের আজ্ঞাবাহক হইয়া যখন যে অঙ্গের সঞ্চালন করিতে ইচ্ছা হয়, সেই অঙ্গের পেশীকে সঙ্কুচিত করে। কতকগুলি স্নায়ু, হৃদয় পাকযন্ত্র প্রভৃতির কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করে। অন্যবিধ কতক গুলি, চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ থাকিয়া বাহ্য-জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ রহিয়াছে। আমাদের শরীরের যে কোন স্থানে ভাবান্তর হউক না কেন, তাহা স্নায়ুদ্বারা মস্তিষ্কে বিজ্ঞাপিত হইয়া তাহার উদ্বোধ জন্মাইয়া দেয়। মস্তিষ্ক আমাদের সর্ব্ব প্রকার মনোবৃত্তির আধার। মস্তিষ্কের কোন অংশ আহত বা বিনষ্ট হইলে বৃত্তিবিশেষ নিস্তেজ অথবা এককালে অন্তর্হিত হইয়া যায়। অন্যান্য জীবের উপরি মনুষ্য যে প্রাধান্য করিতেছেন, উৎকৃষ্ট স্নায়ুযন্ত্র থাকাই তাহার প্রধান কারণ। যদি আমাদের স্নায়ুযন্ত্র এত সুকৌশলে গঠিত না হইত, তাহা হইলে মনুষ্য ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকিত না। স্নায়ু-যন্ত্রের সবিশেষ বিবরণ লিখিতে গেলে পুস্তকের আকার বৃহৎ হইবে, এই আশঙ্কায় এস্থলে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা গেল। টেলিগ্রাফের তার যেরূপ তাড়িতের প্রভাবে অতি

দূরবর্ত্তী প্রদেশে সংবাদ বাহন করে, স্নায়ুগণ সেইরূপ তাড়িৎবৎ পদার্থের বলে শরীরের সংবাদবাহক রহিয়াছে। স্নায়ুর অন্তর্গত তাড়িৎ শরীরেই উৎপন্ন ও ব্যয়িত হইতেছে।

শরীরের আচ্ছাদন চর্ম্ম। ইহা দ্বারা স্পর্শ জ্ঞান জন্মে ও শরীরের মলা অনুক্ষণ বহির্গত হইয়া থাকে। এক বর্গ ইঞ্চ পরিমিত ত্বকে ২৮০০ সূক্ষ্ম ছিদ্র লক্ষিত হয়। ইহার দ্বারা স্বেদ নির্গত হইয়া থাকে। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির শরীরের চর্ম্মে ৭০ লক্ষ ছিদ্র আছে। স্বেদ বাহির হইতেছে বলিয়া রক্ত উষ্ণ হইতে পারে না, ও চর্ম্মের ছিদ্র দিয়া জল বায়ু প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া রক্তের শীতলতা সম্পাদন করে। জ্বরকালে ত্বকের কার্য্য রোধ হয়, তাহাতে অসহ্য গাত্রদাহ উৎপন্ন হয়। ত্বক্‌ পরিষ্কৃত না রাখিলে নানা রোগ জন্মিয়া থাকে। আমাদের নখ এবং কেশ চর্ম্মের রূপান্তর মাত্র। কেশের মূল হইতে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ বহির্গত হয়, তাহাতেই ইহার মসৃনতা সম্পাদিত হয়। স্বেদ ব্যতীত মলমূত্ররূপে এবং শ্বাসযন্ত্র হইতে বাষ্পাকারে শরীরের অনেক দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়।

স্বেদ প্রথমতঃ বাষ্পাকারে বহির্গত হয়। অধিক পরিমাণে নির্গত হইলে বাষ্প শীতল হইয়া জলীয় আকারে পরিণত হয়। তখনই আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। পদার্থ মাত্রেরই সাধারণ গুণ এই যে, কোন বস্তু বাষ্পীয় ভাব ধারণ

করিলে নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে, অর্থাৎ তাহাকে শীতল করিয়া ফেলে। এই কারণবশতঃ ঘর্ম্ম হইলে রক্ত শীতল হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, দৃঢ় অস্থিময় কঙ্কালের অন্তর্গত স্থানে পাকযন্ত্র প্রভৃতি অবস্থিত। সকলেই পাকযন্ত্রের কার্য্য কিছু না কিছু পর্য্যালোচনা করিয়া থাকিবেন, কিন্তু তদ্দ্বারা যে বিশেষ বিশেষ কার্য্য হয় এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। ছাত্রদিগের বোধ সৌকর্য্যার্থে ইহার দুইটী চিত্রময় প্রতিরূপ দেওয়া গেল।

পাকযন্ত্র। ১ম চিত্র।
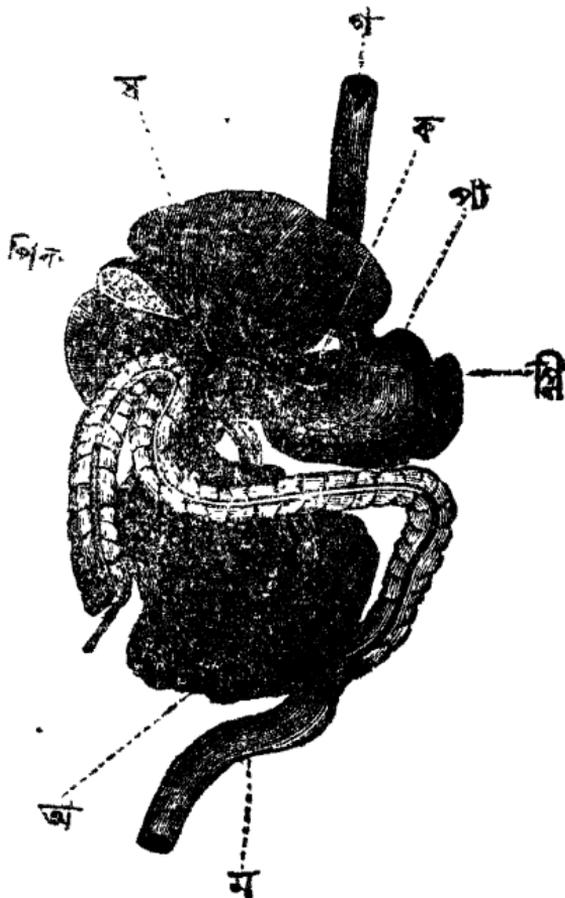
(গ) অন্ননালী। (পা) আমাশয়। (য) যকৃত। (পি,ক) পিত্তকোষ। (ক) ক্লোম। (প্লি) প্লীহা। (অ) ক্ষুদ্রঅন্ত্র। (ম) মলনির্গম।

মলনির্গমের পূর্ব্বেই বৃহৎ অন্ত্র।

পাকযন্ত্র। ২য় চিত্র।
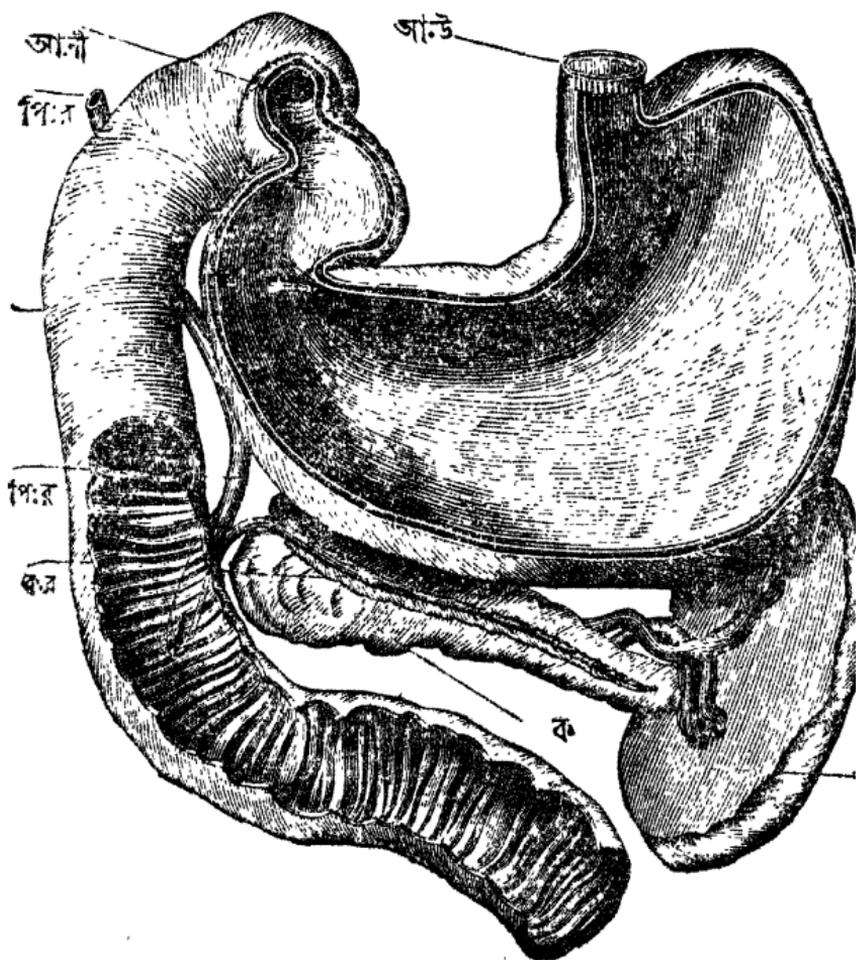
(আ) আমাশয়। (আ উ) আমাশয়ের উপরের মুখ। (আ. নী) আমাশয়ের নীচের মুখ। (পি. র) পিত্তরস।

(ক) ক্লোম। (ক. র) ক্লোমরস।

আমরা মুখ দ্বারা আহার গ্রহণ করি। দুগ্ধাদি তরল দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে হয়। চর্ব্বণকালে দন্তদ্বারা পিষ্ট ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য অন্ন-নালী নামক পথে গমন করে। পরে উদরের কিঞ্চিৎ বামভাগে থলির ন্যায় স্থানে উপস্থিত হয়। এই স্থানকে আমাশয় কহে। আমাশয়ে উপস্থিত হইবা মাত্র, তথা হইতে এক প্রকার তীব্র অম্লরস উৎপন্ন হইয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়, তাহাতে পরিপাক হইতে থাকে। এই রসকে আমাশয়িক রস কহে। এই রসের সহিত মিলিত হইয়া আমাশয়ের শক্তিবিশেষে বারম্বার ইতস্ততঃ চালিত ও ঘূর্ণিত হইতে হইতে ভুক্ত দ্রব্যের কিয়দংশ দ্রব হয় ও অবশিষ্টভাগ কর্দ্দমের ন্যায় হইয়া উঠে। পরে উক্ত দ্রব্য এক নলাকৃতি সুদীর্ঘ নাড়ীতে প্রবেশ করে। এই নাড়ীর নাম ক্ষুদ্রঅন্ত্র বা পক্বাশয়, এই নাড়ীতে থাকিতে থাকিতে যন্ত্রবিশেষ হইতে নিঃসৃত আরও তিন প্রকার রসের সহিত ভুক্ত দ্রব্যের মিলন হয় ও তৎপরে পাকক্রিয়া সমাধা হয়। আমাদের উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে যকৃৎ নামক এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতে পিত্তরস নির্গত হয়। উদরের বামদিগে আমাশয়ের নিম্নে আড়ভাবে অবস্থিত ক্লোমনামে এক যন্ত্র আছে, তাহা হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়। এই দুই প্রকার রস, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রণালী দিয়া পক্বাশয়ের এক স্থানে উপস্থিত হয়।

আর এক প্রকার রস পক্কাশয়ের গাত্র হইতে নির্গত হয়। এই তিন প্রকার রস, আমাশয়িক রস, ও লালা, ইহাদের মধ্যে একটীর অভাব বা অল্পতা হইলে পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মে।

যে পাঁচ প্রকার পাচক রসের উল্লেখ করা গেল, তাহাদের শক্তি একরূপ নহে। খাদ্যদ্রব্যের প্রকৃতি অনুসারে রসবিশেষের কার্য্যকারিতা দেখা যায়। তৈলাদি পদার্থ ও মাংস পরিপাক করিতে লালার সহায়তা আবশ্যক করে না। চাল, গোম প্রভৃতি লালা ও অন্ত্রের রস যুক্ত না হইলে কোন মতেই পরিপাক পায় না। মাংসাদি কতক গুলি দ্রব্য আমাশয়িক রসে জীর্ণ হয়।

পরিপাক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে হইতে খাদ্যের সারভাগ ক্রমে ক্রমে আমাশয় ও পক্কাশয় সংলগ্ন অসংখ্য নাড়ীদ্বারা রক্তে নীত হইয়া তাহার পুষ্টিকারিতা সম্পাদন করে। অসার ভাগ মলরূপে পরিণত হইয়া বৃহৎ অন্ত্রে সঞ্চিত হয়, এবং সময় অনুসারে নির্গত হইয়া পড়ে।

ভুক্ত দ্রব্য রক্তে পরিণত হয়, এই রক্ত প্রয়োজনানুসারে শরীরের সর্ব্ব স্থানের অপচয়নিবারণ ও সংবর্দ্ধন করে। কিরূপে এই কার্য্য সাধিত হয়, এক্ষণে তাহাই বলা যাইতেছে। ইহাকে রক্তসঞ্চালন কহে। এই ক্রিয়া হৃদয়, ধমনী, কৈশিকা ও শিরাদ্বারা সাধিত হয়। রক্ত ফুস্‌ফুস, যকৃৎ প্রভৃতি যন্ত্র দ্বারা বিশোধিত হইয়া দেহ রক্ষার উপযোগী হয়। ক্রমে ইহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রথমতঃ হৃদয় ফুস্‌ফুসের ও পরে রক্তসঞ্চালনের চিত্র দেওয়া যাইতেছে।

হৃদয় ও ফুসফুস।
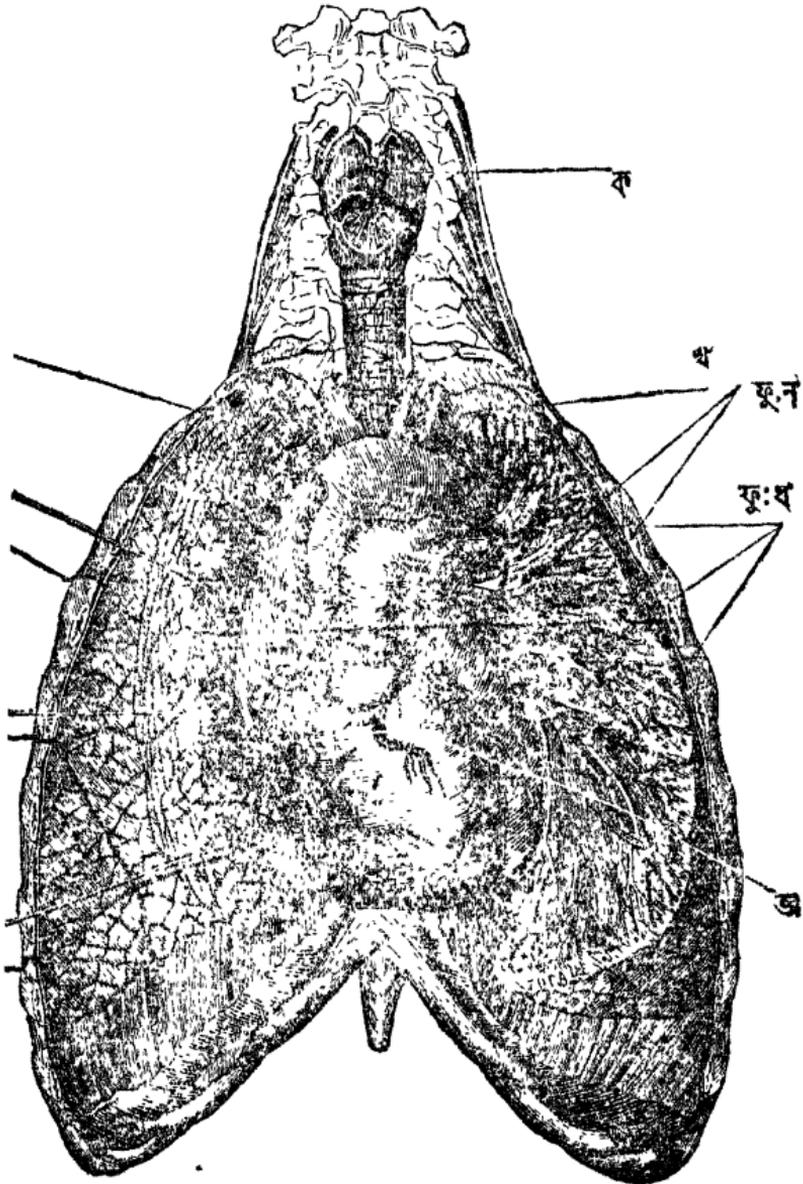
(ক) কণ্ঠনালী বা বায়ু প্রবেশ। দুই পার্শ্বে বিস্তৃত অংশ, দুই ফুস্‌ফুস্। মধ্য স্থানে হৃদয়।

(ফু. ধ) ফুস্‌ফুসীয় ধমনী।
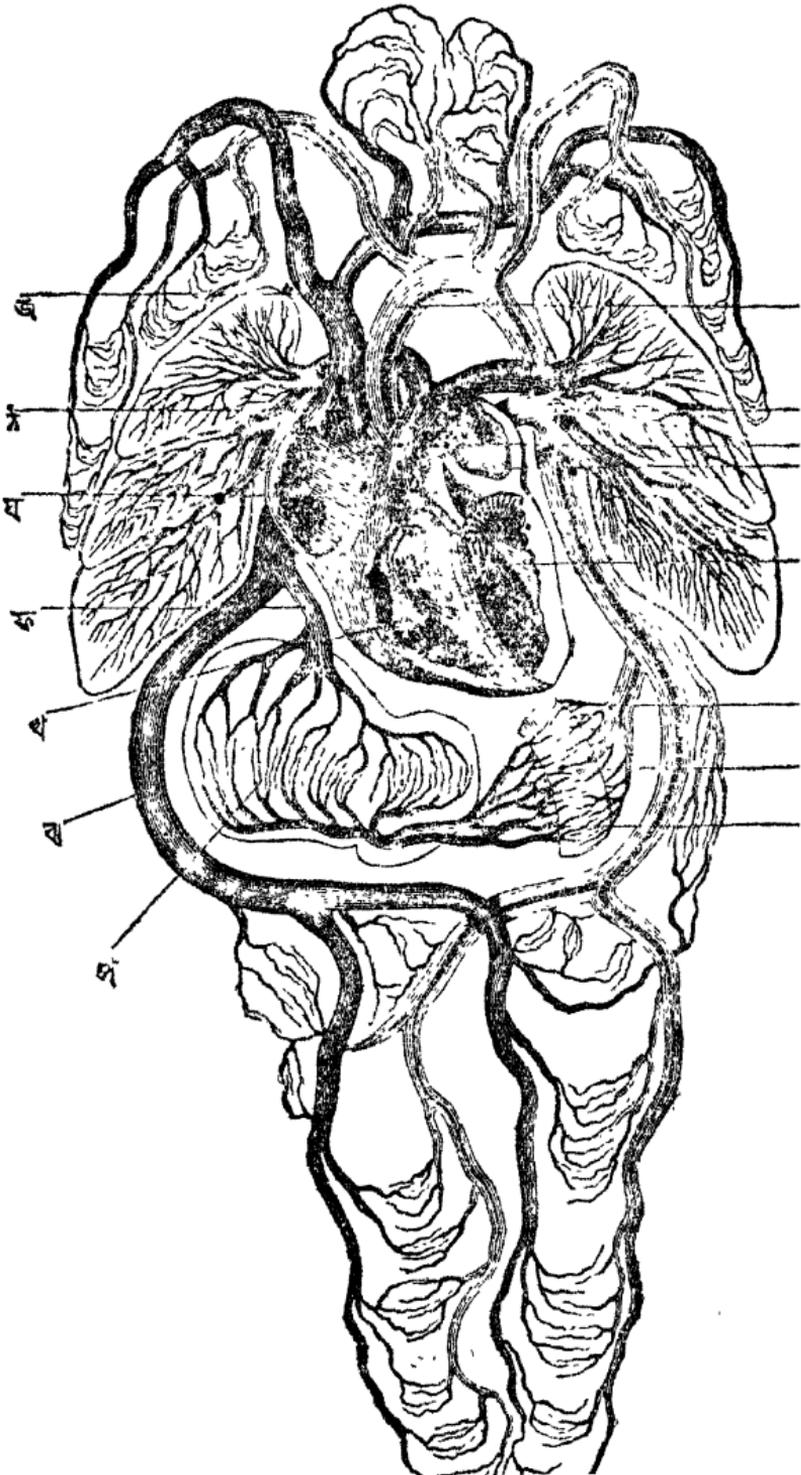
রক্ত সঞ্চালনের চিত্রের ব্যাখ্যা।

(ঠ) ও (র) ফুস্‌ফুসীয় শিরা।

(ট) ফুসফুসীয় ধমনী।

(ঙ) ও (গ) হৃদয়ের বামকোটরদ্বয়।

(ঘ) ও (খ) হৃদয়ের দক্ষিণ কোটরদ্বয়।

(ল) স্থূল ধমনী।

(জ) ও (ঝ) স্থূল শিরাদ্বয়।

ঈষৎ কৃষ্ণাভ রেখা গুলি, ধমনী।

গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ রেখা গুলি, শিরা।

(ন) আমাশয় অন্ত্র প্রভৃতি।

(ম) আমাশয় প্রভৃতির ধমনী।

(প) যকৃৎ।

(ফ) যকৃৎ হইতে প্রেরিত শিরা।

হৃদয় ও ফুস্‌ফুস্‌ আমাদের বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে অবস্থিত; মধ্যস্থলে হৃদয় ও দুই পার্শ্বে দুই ফুস্‌ফুস্‌। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে বিশোধিত রক্ত আসিয়া হৃদয়ের বাম কোটরে উপনীত হয়, ও তথাকার পেশীবলে একটী স্থূল রক্তবাহিকা নাড়ীতে প্রেরিত হয়। এই নাড়ী হৃদয়ের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে বক্র ভাবে উঠিয়া পরে শরীরের অভ্যন্তর দিয়া নিম্নপ্রদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে। ইহার কয়েকটী শাখা মস্তিষ্ক, হস্তপদ, পাকযন্ত্র প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হইয়াছে, ইহাদের সূক্ষ্মতর নানা শাখা বহির্গত হইয়াছে। ইহাদিগকে ধমনী কহে। ধমনী হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম

প্রশাখা বাহির হইয়া শরীরের সকল অংশে ব্যাপ্ত হই-য়াছে। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ব্যতিরেকে দৃষ্টিগোচর হয় না। ইহাদিগকে কৈশিকা বলা যায়।

ধমনী ও কৈশিকা পথে চালিত রক্ত দেহের পোষণ-কার্য্যে লাগে। দেহের ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধিসাধন ইহা-দের কার্য্য। রক্তের পুষ্টিকর ভাগ এই কার্য্যে ব্যয়িত হইলে, অবশিষ্ট অংশ ভিন্নপ্রকার নাড়ী বিশেষে নীত হয়। ইহাদিগকে শিরা কহে। কৈশিকার অন্তও শিরার মূল একই, এজন্য কৈশিকা হইতে শিরাতে রক্ত সঞ্চরণ করিতে পারে।

শিরাসকল প্রথমতঃ কৈশিকার ন্যায় অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শাখায় বিভক্ত থাকিয়া পরে দুইটী স্থূল প্রধান শিরায় মিলিত হইয়াছে, একটী মস্তিষ্ক ও হস্তদ্বয় হইতে, অপরটী পদাদি নিম্নপ্রদেশ হইতে রক্তগ্রহণ করিয়া হৃদয়ের দক্ষিণ কোটরে প্রেরণ করে। শিরাস্থ রক্ত হৃদয়ে আসিবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে খাদ্য দ্রব্যের রস ও শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশের সহিত মিশ্রিত হয়। শিরা ও ধমনী প্রায় পাশাপাশী হইয়া শরীরের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত আছে।

ধমনীর রক্ত উজ্জ্বল লোহিতবর্ণ, শিরার রক্ত কাল। এইরূপ বর্ণের বিভিন্নতা, গুণের বিভিন্নতা বশতঃ হইয়া থাকে। দুই প্রকার রক্তের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান; তন্মধ্যে

ধমনীর রক্তে অম্লজান বাষ্প ও শিরার রক্তে অঙ্গারক বাষ্পের আধিক্য নিরূপিত হইয়াছে। রক্তে শেষোক্ত প্রকার বাষ্পের আতিশয্য হইলে প্রাণনাশক হইয়া উঠে। রক্ত, শিরা হইতে হৃদয়ের দক্ষিণ কোটরে আসিবা মাত্র একটী বৃহৎ ফুস্‌ফুসীয় ধমনী দিয়া ফুস্‌ফুসে প্রেরিত হয়, ও তাহার শাখা প্রশাখা দিয়া ফুস্‌ফুসের সর্ব্ব স্থানে ব্যাপ্ত হয়।

ফুস্‌ফুস্‌ হৃদয়ের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত ও বাম ও দক্ষিণ একাকার দুই অংশে বিভক্ত। দক্ষিণ পার্শ্বের অংশটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ফুস্‌ফুস্‌ সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বায়ুকোষ দ্বারা গঠিত। নিশ্বাস গ্রহণ করিলে বায়ু উভয় ফুস্‌ফুসে যাইয়া বায়ুকোষসকল বায়ুপূর্ণ করে। বায়ু-কোষের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে অসংখ্য কৈশিকা ব্যাপ্ত আছে। এই সকল কৈশিকার গাত্রভেদ করিয়া বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্প রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং কৈশিকার গাত্রভেদ করিয়াই রক্তস্থদূষিতবাষ্প সকল বায়ুকোষ পথে বহির্গত হয়। অঙ্গারক বাষ্পের বিনিময়ে বায়ুস্থিত অম্লজানবাষ্প রক্তে গৃহীত হইয়া ইহার উজ্জ্বল লোহিত বর্ণ সম্প্রদান করে। বায়ুসমাগমে রক্ত বিশোধিত হইলে, ফুস্‌ফুসের অসংখ্য * শিরাপথে আসিয়া পরি-

* যে সকল নাড়ীদ্বারা হৃদয়ে রক্ত আনীত হয়, তাহাদিগকে শিরা, ও যদ্দ্বারা রক্ত হৃদয় হইতে শরীরে প্রেরিত হয়, তাহা-দিগকে ধমনী কহা যায়। এই জন্য হৃদয় হইতে যে নাড়ী দ্বারা

শেষে দুই প্রধান শিরা দিয়া হৃদয়ের বাম কোটরে উপনীত হয়, এবং হৃদয়ের পেশীবলে পুনরায় ধমনীপথে চালিত হইয়া শরীরপোষণকার্য্যে ব্যাপৃত হয়। বিশোধিত রক্ত হৃদয়ের বাম কোটর হইতে গমন করিয়া তথায় প্রত্যাগমন করিলে যে ক্রিয়া হয় তাহার নাম রক্ত সঞ্চালন। ইংরাজেরা ইহাকে রক্তের চক্রভ্রমণ বলিয়া থাকেন।

নিশ্বাস পরিত্যাগকালে ফুস্‌ফুস্‌ হইতে যে বায়ু বহির্গত হয় তাহার উপাদান বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদানের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধাবস্থায় অম্লজান বাষ্প ইহাতে যে পরিমাণে মিলিত থাকে, এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে; পূর্ব্বে ৫০০০ ভাগে দুই ভাগ দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প ছিল, এক্ষণে ১০০ ভাগের মধ্যে ৩।৪।৫।৬ ভাগ এই বাষ্প অবধারিত হইতেছে; এক্ষণে ইহাতে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কিয়ৎভাগ আমোনিয়া, উদজান ও নানাপ্রকার উদ্বায়ু পদার্থ দেখা যায়। শেষোক্ত পদার্থ জনিত দুর্গন্ধ সচরাচর অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। এই রূপ পরিবর্ত্তন বশতঃ ইহাদ্বারা আর নিশ্বসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। দ্ব্যম্লঅঙ্গারক বাষ্পের ভাগ অধিক হওয়াতে ইহা প্রাণ-নাশক হইয়া উঠিয়াছে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কি প্রকারে উক্ত নানা-

দূষিত রক্ত ফুস্‌ফুসে প্রেরিত হইয়াছে তাহাকে ধমনী, ও ফুস্‌ফুস হইতে যে দুই নাড়ী দিয়া বিশোধিত রক্ত হৃদয়ে আসিতেছে তাহাকে শিরা বলা গেল।

বিধ অভিনব দূষিত পদার্থ ফুস্‌ফুস্‌-হইতে-বহির্গত বায়ুতে উপস্থিত হইল? শরীরের মধ্যে প্রবেশকালে বায়ুতে এসকল পদার্থ ছিল না, সুতরাং তাহারা দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক কার্য্যবিশেষদ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে।

আমাদের শরীরের নিষ্প্রয়োজনীয় কিংবা দূষিত পদার্থ কেবল ফুস্‌ফুস্‌ দিয়া বহির্গত হয় এরূপ নহে। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ইহা ত্বক্‌, মূত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্র দিয়াও বহিষ্কৃত হইয়া থাকে। আমাদের যকৃৎ যন্ত্রও এই কার্য্যের উপযোগী। আমাশয় ও অন্ত্রসংলগ্ন অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরাসমূহ তথা হইতে ভুক্ত দ্রব্যের রস গ্রহণ করে এবং এই রস রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া যকৃতে আনিয়া থাকে। অন্যান্য শিরা যেমন সাক্ষাত সম্বন্ধে হৃদয়াভিমুখে রক্ত প্রেরণ করে এই গুলি সেরূপ না করিয়া যকৃতে প্রেরণ করে। যকৃতে উপস্থিত হইলে রক্তাদি হইতে পিত্তরস বাহির হয়। পিত্তরস বাহির না হইলে তাহা রক্তের সহিত সঞ্চালিত হইয়া দেহে চালিত হইয়া বিষবৎ অনিষ্টকারী হইত; এদিগে যকৃৎ হইতে পিত্তরস অন্ত্রে গমন করিয়া পরিপাককার্য্যের যে সাহায্য করে তদভাবে নানা অনিষ্ট হইত।

যকৃতের শক্তিতে রক্ত হইতে পিত্তরস পৃথক্‌ হইতে হইতে রক্তের অনেক রূপান্তর সাধিত হয়। এই কার্য্যটী হয় বলিয়া রক্ত দেহরক্ষা করিবার উপযোগী হইয়া

উঠে। প্লীহা ও যকৃৎ পরস্পর যেরূপ সম্বদ্ধ তাহাতে বোধ হয় প্লীহা দ্বারা যকৃতের কার্য্যের অনেক সাহায্য হয়। ফলতঃ এই দুয়ের মধ্যে একটীর রোগ জন্মিলে প্রায়ই অপরটীর রোগ জন্মিয়া থাকে। যকৃতের রোগ হইলে পিত্ত সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হয়, সুতরাং তাহা রক্তের সঙ্গে থাকিয়া শরীরে চালিত হয়. তাহাতে শরীর হরিদ্রা-বর্ণ ধারণ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।
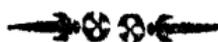
খাদ্য।

সংসারে যত প্রকার রোগ আছে, তাহার অধিকাংশই অতিভোজন বা অনুপযুক্তদ্রব্যভোজন হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অজীর্ণদোষ, জ্বর, শূল, রক্তাতিসার, যকৃদ্দোষ, মস্তিষ্কের পীড়া, কাশ, শ্বাস, প্রভৃতি রোগ হইয়া যে কত লোকের অশেষ ক্লেশ ও অকালমৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। অতএব কিরূপ নিয়মে আহার করা উচিত, তদ্বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, আমরা যাহা আহার করিয়া থাকি, তাহার সারভাগ রক্তরূপে পরিণত হইয়া শরীরের পোষণ করে। অতএব যে সকল পদার্থ দ্বারা শরীরের পুষ্টিসাধন হইতে পারে, সেই সকল পদার্থই আমাদের খাদ্য। চাল, ডাল, গোম, তেল, মাচ, মাংস, আলু, দুধ, চিনি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আমরা সচরাচর আহার করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের পুষ্টিকারিতাগুণ থাকাতেই তাহারা উৎকৃষ্টখাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

শিশুগণ মাতৃস্তন্য পান করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে, বয়োবৃদ্ধি সহকারে অন্যবিধ আহারের প্রয়োজন হয়। তখন আর শুদ্ধ দুগ্ধের উপর নির্ভর করিলে চলে না। কিন্তু দুগ্ধে যে সকল উপাদান থাকাতে তদ্দ্বারা শিশুশরীরপোষণ হয়, তৎসমুদায় নিরূপণ করিলে যে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণবয়স্কদিগের খাদ্যের প্রয়োজনীয় উপাদান স্থির করা যাইতে পারে, তাহা সন্দেহ নাই। এই নিমিত্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা দুগ্ধকে আদর্শ স্থির করিয়া খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করিয়াছেন। ১০০০ ভাগ দুগ্ধে নিম্নলিখিত পরিমাণে কয়েক প্রকার উপাদান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জল	৮৭৩	(১)
পনিরময় পদার্থ	৪৮	(২)
শর্করা	৪৪	(৩)

তৈলময় পদার্থ......	৩০	....	(৪)
নানাবিধ খনিজ পদার্থ	৫	.. :	(৫)

১০০০

এই পাঁচ প্রকার পদার্থের মধ্যে জল, এবং লবণ চূর্ণ প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য আমরা পৃথক্‌রূপে খাদ্যের সহিত প্রয়োজনমত মিশ্রিত করিয়া লইতে পারি; অনেক সময়ে তাহারা খাদ্যের সহিত স্বতই মিশ্রিত থাকে। দুগ্ধের যে অংশদ্বারা পনির প্রস্তুত হয় তাহাকে পনিরময় পদার্থ বলিয়া উল্লেখ করা গেল। ইহাতে যবক্ষারজান বিদ্যমান আছে; এজন্য ইহাকে যবক্ষারজান-বিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। অবিশিষ্ট কয়েক প্রকার উপাদানকে যবক্ষার-জান-বিহীন বলা যাইবে। দুগ্ধের যে পাঁচ প্রকার উপাদানের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহা সকল প্রকার খাদ্য দ্রব্যে সমান পরিমাণে ও একাকারে পাওয়া যায় না। পনিরময় পদার্থের ন্যায় যবক্ষারজান-বিশিষ্ট উপাদান,—পক্ষ্যাদির ডিম্বে, মাংসে, এবং গোম, চাল, ডাল প্রভৃতি শস্যে পাওয়া যায়। শর্করাদ্বারা শরীরের যে কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, চাল, গোম, সাগু, আরোরুট প্রভৃতির শুভ্র-ভাগ পরিপাক হইয়াও সেই কার্য্যে লাগে। শর্করা, এবং গোম প্রভৃতির শ্বেতসার এক জাতীয় পদার্থ বলা যাইতে পারে।

যে পাঁচ প্রকার পদার্থের কথা লেখা হইল তাহার

কোনটীর অভাব হইলে শরীর রক্ষা হয় না। যদি গোম বা চালের শ্বেতসার অথবা যবক্ষারজান-বিশিষ্টভাগ বাহির করিয়া লইয়া, কোন ব্যক্তিকে শুদ্ধ তাহার অবশিষ্ট ভাগ রন্ধন করিয়া খাওয়ান যায়, তাহা হইলে তাহার শরীর শুষ্ক হইতে থাকে ও পরিশেষে মৃত্যু উপস্থিত হয়। দুগ্ধ ব্যতীত এমন কোন দ্রব্য নাই, শুদ্ধ যাহার উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল শরীর ধারণ করা যায়। শস্যাদির মধ্যে গোম প্রধান। শুদ্ধ গোম আহার করিয়া অনেক দিন বাঁচিয়া থাকা যায়, এই নিমিত্ত ইহা অনেক দেশে ব্যবহৃত। ইহাতে তৈলের ভাগ না থাকাতে আমরা ঘৃত সংযোগ করিয়া রুটী বা লুচী প্রস্তুত করিয়া থাকি।

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তাহার কিয়দংশ শরীরের অভ্যন্তরে যাইয়া রাসায়নিক কার্য্য-বিশেষ দ্বারা তাপ উদ্ভাবন করে, তাহাতে শরীরের স্বাভাবিক তাপ রক্ষা হয়। অবশিষ্টভাগদ্বারা শরীরের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশ পুনর্নির্ম্মিত হয়। চাল, গোম প্রভৃতির শ্বেতসার এবং শর্করা, তৈল প্রভৃতি দ্রব্য, প্রধানতঃ তাপ উদ্ভাবনে ব্যয়িত হয়; যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহা মেদ রূপে পরিণত হইয়া, কিয়দংশ পেশী, মস্তিষ্ক প্রভৃতির তৈলময় অংশ রূপে এবং অবশিষ্টাংশ স্বতন্ত্র, শরীরের অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। জল, অধিক পরিমাণে শরীরের সকল অঙ্গেই বিদ্যমান আছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে লবণ,

লৌহ প্রভৃতি রক্তে ও পেশী প্রভৃতি যন্ত্রে প্রাপ্ত হওয়া যায়। চূর্ণ প্রভৃতি কঠিন খনিজদ্রব্য দ্বারা অস্থিনির্ম্মাণ হয়। যে সকল দ্রব্য যবক্ষারজানবিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা পেশী প্রভৃতির অধিকাংশ নির্ম্মিত।

আমাদের দেশে অপুষ্টিকরদ্রব্যভোজন করিয়া বৎসর বৎসর যে কত লোকের মৃত্যু হইতেছে, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। যে কয়েক প্রকার পদার্থের উল্লেখ করা গিয়াছে, হয় ত তাহার মধ্যে যবক্ষার-জান-বিশিষ্ট পদার্থ উপযুক্ত পরিমাণে না পাইয়া অনেক দুঃখী-লোক নিতান্ত দুর্ব্বল ও ক্ষীণকায় হইয়া পড়ে, ও ক্রমে ক্রমে অনাহার-মৃত্যুর সমুদয় লক্ষণাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। কিন্তু তাহারা পুষ্টিকর আহার পাইলে অল্পদিনের মধ্যে সবল ও সুস্থ হইয়া উঠে। এদেশে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেও অনেকে আবশ্যকমত দুগ্ধ, ঘৃত, মৎস্যাদি না খাইয়া রুগ্ন হইয়া পড়েন। আহার বিষয়ে স্ত্রীজাতির যে স্বাভাবিকী লজ্জা আছে তাহার বশীভূত হইয়া তাঁহারা পুরুষবর্গকে সমুদায় উৎকৃষ্ট দ্রব্য অর্পণ করিয়া আপনারা অতি সামান্য দ্রব্য আহার করিয়া কতই ক্লেশ পাইয়া থাকেন। ভদ্রলোকের মধ্যে অনেকে পীড়া হইতে মুক্ত হইয়া, পরে পুষ্টিকর আহারাভাবে দীর্ঘকাল দুর্ব্বল থাকেন, ও পুনঃ পুনঃ রোগাক্রান্ত হন।

দেহ ভ্রমণ করিতে করিতে রক্তের পুষ্টিকর পদার্থ

শরীরের কার্য্যে বিনিযুক্ত হইয়া গেলে, নূতন পদার্থের আবশ্যক হওয়াতে ক্ষুধা উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে আহার-গ্রহণে প্রবর্ত্তিত করে। আপাততঃ বোধ হয় যেন পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহা সর্ব্ব শরীর-ব্যাপী। যদি আহার-গ্রহণ করিবামাত্র ক্ষুধা-জনিত ক্লেশ এককালে দূর হইত, তাহা হইলে পাকযন্ত্রই ক্ষুধার স্থান বলিয়া বিশ্বাস হইত। উপবাসের পর আহার করিলে, তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বদৌর্ব্বল্য যায় না, যে পর্য্যন্ত অন্নের কিয়দংশ পরিপাক হইয়া রক্তে মিলিত না হয় ততক্ষণ কোনমতেই শরীর সুস্থ হয় না।

কাহারও বা আহারগ্রহণের অতি অল্পক্ষণ পরে, কাহারও বা অধিক ক্ষণ পরে, ক্ষুধা উপস্থিত হয়। পূর্ণ বয়স্ক অপেক্ষা শিশুদিগের ক্ষুধা শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে; সরীসৃপ ও মৎস্য অপেক্ষা পক্ষী ও স্তন্য-পায়ী জীবের ক্ষুধা সত্বর হয়। মনুষ্য প্রভৃতি যে সকল জীবের রক্ত উষ্ণ, শীত হইলে তাহাদের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়; সরীসৃপ প্রভৃতি শীতলরক্তবিশিষ্ট জীবগণ শীতকালে প্রায় ক্ষুধিত হয় না, এবং অধিক শীতবোধ হইলে ইহারা এক-কালে আহার গ্রহণ করে না। তৃণ ও শস্যাহারী জীব অপেক্ষা মাংসাদ জীবগণ অধিককাল অনাহারী থাকিতে পারে। ফলতঃ পরিশ্রম, শীতোষ্ণতা, বয়ঃক্রম, অভ্যাস প্রভৃতি কারণে ক্ষুধাকালের তারতম্য হইয়া থাকে।

দীর্ঘকালঅনাহারী ব্যক্তিদিগের মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর;

শরীর শীর্ণ, মুখশ্রী নীলবর্ণ, গণ্ড দেশ ক্ষীণ, চক্ষুদ্বয় অনৈসর্গিকতেজোবিশিষ্ট ও নিমেষ-শূন্য। শরীর-চালনা অতি কষ্টকর হয়, হস্তদ্বয় নিয়ত কাঁপিতে থাকে, মুখ হইতে বাক্য নিঃসরণ হয় না, ও বুদ্ধিশক্তি এককালে অন্তর্হিত বোধ হয় : কিছু জিজ্ঞাসা করিলে একমাত্র উত্তর পাওয়া যায়, "আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি"। স্নায়ুযন্ত্র আর অন্ন পরিপাকাদি ক্রিয়ার সম্পাদন করিতে না পারিয়া অস্থির হইয়া উঠে, এবং হতভাগ্য ক্লেশিত ব্যক্তিদিগকে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও দেয় না; এইরূপে তাহারা উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠে। খাদ্য ও পানীয় শূন্য থাকিলে কেহ কেহ, ২।৩ দিন, কেহ বা ১৫।১৬ দিনের মধ্যে প্রাণত্যাগ করে।

কি পরিমাণে কি কি দ্রব্য আহার করিলে শরীর সবল থাকে তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে অভ্যাসই প্রধান; কোন ব্যক্তি অধিক খাইয়াও অনায়াসে পরিপাক করিতে পারেন; অন্য কেহ তৎপরিমাণে খাইলে তৎক্ষণাৎ পীড়িত হইয়া পড়েন। এক ব্যক্তি যে দ্রব্য খাইয়া সুস্থ ও সবল থাকেন, অন্য ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিষের ন্যায় অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। কিন্তু সচরাচর অনেকেই অতিভোজন করিয়া ক্লেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে পর্য্যন্ত উদর স্ফীত হইয়া না উঠে, ততক্ষণ আহার করা কর্ত্তব্য। এরূপ বিবেচনা মূর্খতাবশতই হইয়া থাকে। যাহা হউক ধীরে ধীরে চর্ব্বণ

করিয়া আহার করিলে, ক্ষুধা-শান্তি হইল কি না তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইতে পারে। তাড়াতাড়ি করিয়া খাইলে অল্প সময়ে অধিক অন্ন উদরস্থ হয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেই যে শীঘ্র শীঘ্র শরীর-পোষণ হয় এরূপ নহে। এদেশের স্ত্রীদিগের অজ্ঞতাদোষে অতিভোজনের প্রাদুর্ভাব হইতেছে। অধিক আহার দিলে শিশু-সন্তানেরা শীঘ্র শীঘ্র সবল হইবে ভাবিয়া তাঁহারা কত অনিষ্ট করিয়া থাকেন। সকল শিশুই প্রায়ই উদরাময় প্রভৃতি ক্লেশকর রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে, ও অনেকে অল্প বয়সে মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অবোধ জননীদিগকে চিরদুঃখিনী করিয়া যায়। কিন্তু মূর্খতা কি সুখের বিষয়! প্রকৃত কারণ না জানাতে তাঁহাদের কোন অনুতাপই হয় না। শৈশবাবস্থায় অতিভোজন অভ্যাস হইলে আমাদের স্থিতিস্থাপক পাকস্থলীর আয়তন বৃদ্ধি হয়, সুতরাং প্রয়োজনাতিরিক্ত আহার না করিলে আর তৃপ্তি বোধ হয় না, ক্রমে যত বয়োবৃদ্ধি হয়, ততই অপরিমিত আহারে প্রবৃত্তি জন্মিয়া যায়। যাহারা মাতৃক্রোড়ে এরূপ দোষাকর ব্যবহারে দীক্ষিত হয় তাহাদের বাঁচিবার উপায় কি?

প্রসিদ্ধ ডাক্তার ফাউলার, খাদ্যের উপযুক্ত পরিমাণ নির্ণয়করণবিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছেন, এস্থলে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল।

খাদ্যের পরিমাণ স্থির করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

অপরিমিত দ্রব্য খাইয়া লোকের যত পীড়া হয়, অনুপযুক্ত দ্রব্য ভোজনে তত কখনই দেখা যায় না। অনেক পীড়িত ব্যক্তি, উপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য পাইয়াও অপরিমিত ভোজন দোষে রোগমুক্ত হইতে পারে না। অনেক সভ্য জাতির প্রধান প্রধান লোকও ঔদরিকতা-দোষের উদাহরণ স্থল হইয়াছেন। আমরা সচরাচর যে পরিমাণে আহার করি, তাহার অর্দ্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ খাইলেই শরীর রক্ষা হইতে পারে। অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন যে গুরুতর আহারান্তে, শরীর ও মন অসুখের আলয় হইয়া উঠে, এবং কখন কখন উপবাস করিলে মনের প্রফুল্লতা ও শরীরের লঘুতা সাধিত হয়। ইহাও লক্ষিত হয় যে উদরাময় রোগগ্রস্ত লোকেরা, অন্যান্য লোকের দ্বিগুণ ও সম্পূর্ণ সুস্থকায় ব্যক্তির চতুর্গুণ আহার করিয়া থাকে।

অনেক বলবান্ ব্যক্তি অপেক্ষা ক্ষীণকায় ব্যক্তির অধিক আহার করে। তাহার কারণ এই, পূর্ব্বোক্ত লোকেরা যাহা কিছু খায় তাহা সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, সুতরাং তাহার সারাংশ শরীরের কার্য্যে লাগে, কিন্তু ঔদরিকের পাকযন্ত্র অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। ইহারা অধিক দ্রব্য উদরস্থ করিয়াও, অনাহারীর ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পরিমিতাহারী লোকেরা দীর্ঘ-জীবী হয়। প্রসিদ্ধ পার সাহেব ১২০ বৎসর বয়ক্রম কালেও নবকুমারের মুখ দেখিয়াছিলেন, এবং ১৫২ বৎসর কাল পর্য্যন্ত সুস্থ শরীরে

ও পূর্ণবুদ্ধিশক্তি সহকারে রাজসভায় উপনীত হন। তিনি যে কঠিন নিয়মে যৎকিঞ্চিৎ আহার করিতেন, রাজ-বাটীতে তাহার অল্পমাত্র ব্যতিক্রম হওয়াতে এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

লুই কর্ণারো শারীরিক অনিয়ম দ্বারা ৩৬ বৎসর বয়ক্রম কালে মুমূর্ষু-দশা প্রাপ্ত হন, কিন্তু মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়া ও প্রত্যহ দেড়-পোয়া মাত্র আহার করিয়া দীর্ঘায়ু হইয়াছিলেন। পরে তিনি অনুরোধে পড়িয়া এক ছটাক আহার বৃদ্ধি করেন, তাহাতে ৮ দিনের মধ্যে তাঁহার শরীর ও মন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, পার্শ্বদেশে বেদনা হয় এবং ৩৫ দিন অনবরত জ্বর হইয়া থাকে। যে ৫৮ বৎসর কাল তিনি নিয়ম রক্ষা করেন, তাহার মধ্যে এই একবার ভিন্ন তাঁহার কখন কোন পীড়া হয় নাই।

রিচার্ড লইড্, ১৩০ বৎসর বয়সেও সম্পূর্ণ সবল ও সুস্থ ছিলেন, কিন্তু মদ্য ও মাংস ব্যবহার আরম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই লোকান্তরিত হন। পূর্ব্বে ইনি রুটী, ঘৃত, পনির, ঘোল, প্রভৃতি আহার করিতেন।

ডাক্তার ফাউলার নিজের বিষয় লিখিয়াছেন "যখন চিকিৎসা ব্যবসায়ের অনুরোধে আহার করিতে সময় পাইতাম না, তৎকালে অধিক পরিশ্রম করিতে সমর্থ হইতাম। ছাত্রদিগকে উপদেশ দিবার পূর্ব্বে আহার করিলে ভালরূপ কার্য্য করা যায় না, এবং কোন বিষয়ের রচনা করা অসাধ্য হইয়া উঠে। অল্প পরিমাণে আহার করিলে

অভিনব ভাব শব্দ ও নূতন নূতন উদাহরণ স্থল, পর্য্যায়-ক্রমে স্মরণ পথে উদিত হয়, এবং বুদ্ধিশক্তিও প্রখর থাকে। আমি যত অল্প আহার করি, ততই মানসিক চিন্তা করিতে সক্ষম হই। অতিভোজনে ধর্ম্ম প্রবৃত্তিও জড়তা প্রাপ্ত হয়। লোকে মাতালকে ঘৃণা করে, কিন্তু যে ব্যক্তি যাবজ্জীবন ঔদরিকতাদোষের উদাহরণ স্বরূপ সে তদপেক্ষা অধিক ঘৃণার পাত্র। সমাজের অল্প লোকে মদ্যপান করে, কিন্তু অতি-ভোজনে অনেকেরই জীবন শেষ হইয়া থাকে।"

অনাহারই অতিভোজনজনিত রোগের একমাত্র ঔষধ। উপবাস করিলে বা আহারের পরিমাণ কমাইয়া দিলেই উক্ত প্রকার রোগ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। এই সহজ উপায় অবলম্বন না করিয়া অনেকে নানাপ্রকার ঔষধ খাইয়া থাকেন, কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণ বিদ্য-মান থাকাতে, তাহাতে তাদৃশ উপকার হয় না। এরূপ অবস্থায় ঔষধ-সেবন কেবল অতিভোজনের সহকারিতা করিয়া থাকে। কেহ কেহ অতিভোজনের অনুরোধে সুরা, সিদ্ধি প্রভৃতি মাদক দ্রব্য খাইয়া থাকেন, তাহাতে যে কত অনিষ্টাপাত হয় তাহা বলা যায় না।

আমরা যথেচ্ছাচারী হইয়া আহার করিলে অপকার হইবে, ইহার বিশিষ্ট কারণই দেখা যাইতেছে। যে কয়েকটী শারীরিক রসের সহিত মিলিত হইয়া ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে, এই সকল রস প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট

পরিমাণে উৎপন্ন হয়, ইহাতে যে পরিমাণের দ্রব্য পরিপাক করা যাইতে পারে, তাহার অধিক হইলে ভুক্ত দ্রব্য দীর্ঘ কাল উদরে থাকিয়া পাকযন্ত্র প্রপীড়িত করে, বা উদরাময়, বমন প্রভৃতি রোগ জন্মাইয়া দেয়। দেখা গিয়াছে পীড়াকালে আহার করিলে, তাহা কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তিত ভাবে উদরে অবস্থিতি করে। এজন্য পীড়াকালে আহার বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।

আমাদের শরীরের যে অঙ্গ যত চালনা করা যায়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয় হইয়া থাকে. এই ক্ষতিপূরণ জন্য দেহস্থ রক্ত তদভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হয়। আহার করিবামাত্র পাকস্থলীর কার্য্যারম্ভ হইয়া তত্রত্য পেশীসমূহ দুর্ব্বল হইতে পারে। তখন তাহাদিগকে সামর্থ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তৎপ্রদেশে অধিক পরিমাণে রক্তের গতি হয়। কোনমতে এই গতির ব্যাঘাত হইলে পরিপাক কার্য্যেরও ব্যাঘাত হইয়া উঠে। অতএব আহারকালে বা তাহার অব্যবহিত পরে, শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করিলে অঙ্গ বিশেষে বা মস্তিষ্কে রক্তের অধিক আবশ্যক হওয়াতে, উহা উচিত পরিমাণে পাকযন্ত্রে গমন করিতে পারে না, সুতরাং তাহাতে পরিপাক কার্য্যও সুন্দররূপে হয় না। আহারের অব্যবহিত পুর্ব্বে পরিশ্রম করিলে, রক্ত যে সকল অঙ্গের ক্ষতিপূরণে নিযুক্ত থাকে, তাহা হইতে সহসা পাক-যন্ত্রে ফিরিয়া আসিতে

পারে না, সুতরাং পূর্ব্বমত অনিষ্ট হয়*। অতএব আহার করিবার আধ ঘন্টা পূর্ব্বে ও পরে এবং আহার কালে কোন পরিশ্রম না করিয়া কেবল আমোদ প্রমোদ করা কর্ত্তব্য। মনঃ প্রফুল্ল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে শারীরিক কার্য্য সকল নির্ব্বাহ হইতে থাকে।

খাদ্য দ্রব্য পরিপাকের উপযুক্ত করিবার জন্য, আমরা রন্ধন করিয়া থাকি। কাঁচা চাল সহজে পরিপাক হয় না, কিন্তু ভাত অনায়াসে পরিপাক করা যায়। রন্ধন দ্বারা চাল, গমের শ্বেতসার শর্করাসদৃশ হইয়া উঠে, যবক্ষার-জান-বিশিষ্ট ভাগ কোমল হয়, এবং তৈলাদি জমাট হইয়া যায়। পক্ক আম্র প্রভৃতি কয়েকটী ফল রন্ধন না করিয়াও খাওয়া যায়, কারণ তাহারা পূর্ব্বেই সূর্য্যপক্ক হইয়া থাকে।

আমরা প্রথমতঃ রন্ধন ও পরে দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া পরিপাক কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকি। পেষণ করিবার সময়, খাদ্যের সহিত লালা মিশ্রিত হইয়া তাহার অনেক রূপান্তর করিয়া থাকে। চাল গমের শ্বেতসার লালা সংযোগে শর্করার ন্যায় হইয়া থাকে, তাহা স্বাদ

* এই যুক্তি অনুসারে আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে স্নান করাও অন্যায়। স্নান ও গাত্র মার্জ্জনা করিলে রক্তের গতি ত্বগভিমুখে হয়। সেই রক্ত পাকস্থলীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে স্নান জনিত সুখানুভব হয় না, প্রত্যাবৃত্ত না হইলে ভালরূপে পরিপাক হইতে পারে না।

দ্বারাই অনুভব করা যায়। অতএব রন্ধন কালে অন্ন যাহাতে অপক্ক না থাকে ও চর্ব্বণসময়ে যাহাতে সুন্দর রূপে পিষ্ট ও লালামিশ্রিত হয়, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। যাহারা তাড়াতাড়ি করিয়া ভোজন করে, তাহাদিগকে এবিষয়ে গুরুতর অপরাধী বলিতে হইবে।

পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্যই রন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইহাতে এত কারুকরী উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে যে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। রন্ধন সময়ে এলাচি, মরিচ, শরিষা, দারুচিনি, পলাণ্ডু প্রভৃতি নানা মসলা অধিক পরিমাণে খাদ্যে সংযুক্ত হইয়া তাহার গুণের এত প্রভেদ করিয়া ফেলে যে আর সহজে পরিপাক করা যায় না। অধিক পরিমাণে খাইলে পিপাসা উপস্থিত হয়, ও পাকযন্ত্রের অভ্যন্তর প্রপীড়িত হওয়াতে নানা রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পলান্ন প্রভৃতি ঘৃতমসলাযুক্ত দ্রব্য এতদ্দেশে অধিক পরিমাণে সহ্য হইবার নহে। অধিক পরিমাণে ঘৃত বা তৈলযুক্ত দ্রব্য ল্যাপ্‌ল্যাণ্ড, গ্রীণল্যাণ্ড প্রভৃতি মেরুসন্নিহিত শীতপ্রধানদেশে বিশেষ উপকারী। সেখানে ইহা দ্বারা যেমন সহজে শারীরিক তাপ রক্ষা ও শীতনিবারণ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। ভাত দ্বারাই এতদ্দেশীয় লোকের শরীরের তাপ রক্ষা হইতে পারে। তেল বা চিনি অধিক খাইলে এদেশে গাত্রজ্বালা ও উদরাময় উপস্থিত হয়।

অধিক মসলাযুক্ত দ্রব্য খাইতে গেলে আর একটী দোষ হইয়া থাকে। মসলার অনুরোধ অনেকে অপরিমিত ভোজন করিয়া বসেন। এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। অম্ল, আচার, আমসত্ত্ব প্রভৃতি দ্রব্যেরও এইরূপ দোষ দেখা যায়।

কিন্তু অধিক মসলা যুক্ত দ্রব্য খাওয়া অবৈধ বলিয়া স্বাদগন্ধ-শূন্য মৃত্তিকাবৎ দ্রব্য আহার করিতে হইবে, এমত নহে। যাহা খাইতে অনিচ্ছা হয়, তাহা পরিপাক করা কঠিন হয়।

প্রত্যহ এক দ্রব্য খাইলে আহারে অরুচি হয়, এবং শরীরে যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, তাহাও পাওয়া যায় না, এজন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের শাস্ত্রকারেরা তিথি বিশেষে যে দ্রব্য-বিশেষ খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন বোধ করি তাহার উদ্দেশ্যই এই।

খাদ্য দ্রব্য নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে, ও তাহাতে পাকযন্ত্র সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পরিপাক কার্য্য সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ ৪ ঘণ্টা কালের প্রয়োজন। কিন্তু কেহ কেহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর কিছু কিছু আহার করিয়া থাকেন। উক্তরূপ করাতে পাকযন্ত্র সকল বিশ্রামাভাবে দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিপাকান্তে ২ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম না পাইলে পাকযন্ত্র সকল পুনরায় সতেজ

হইয়া উঠে না। অতএব একবার আহার করিলে অন্ততঃ তাহার ৬ ঘন্টা পরে দ্বিতীয়বার আহার করা উচিত। প্রাতঃকালে ৯ টার সময় খাইলে বৈকালে ৩ টার সময়, ও রাত্রিকালে ৯ টার সময় খাওয়া উচিত। নিদ্রাকালে পরিপাক হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক সময় লাগে। এজন্য পরদিন ৯ টা পর্য্যন্ত অনাহারে থাকিলে ক্লেশ হয় না। আহারান্তে নিদ্রা যাওয়া নিতান্ত অন্যায়। তাহা হইলে অজীর্ণ দোষ হয়। এরূপ হইলে যে পর্য্যন্ত সুন্দর রূপ ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ অনাহারে থাকা উচিত।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, কি পরিমাণে আহার করা উচিত? যদি সকল ব্যক্তির শরীর সমান হইত ও সকল অবস্থায় সমান খাদ্যের প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর সহজ হইত। শরীরভেদে ও শরীরের অবস্থাভেদে আহারের পরিমাণভেদ হইয়া থাকে; এনিমিত্ত সকল ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণ স্থির করা দূরে থাকুক, এক ব্যক্তির সকল সময়ের উপযুক্ত পরিমাণ নিরূপণ করাও দুষ্কর। বহু সংখ্যক লোকের আহার দেখিয়া, গড়্‌পড়্‌তা করিলে যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তির উপযুক্ত পরিমাণ জানা যায় এরূপ নহে। প্রসিদ্ধ লুই কর্ণারো প্রত্যহ প্রায় দেড়পোয়া শুষ্ক খাদ্য দ্রব্য খাইয়া ৫৮ বৎসর কালযাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ অল্পাহারে প্রায় কেহ থাকিতে পারে না। শীতকালে এবং শীতপ্রধান

দেশে অধিক আহারের প্রয়োজন হয়, আর অলস অপেক্ষা শ্রমজীবী লোকে অধিক আহার করিয়া থাকে। যে পরিমাণে আহার করিলে সচরাচর চলিতে পারে তাহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল।

দিবারাত্র মধ্যে পুষ্টিকর শুষ্কদ্রব্য এক সেরের অধিক রন্ধন করিয়া খাইবার প্রয়োজন হয় না। যাহারা দুর্ব্বল, ও যাহাদিগকে পরিশ্রম করিতে হয় না, ইহার অনেক কম পরিমাণে খাইলেই, তাহাদের শরীর রক্ষা হইতে পারে। প্রত্যহ ৩ বারে দেড় পোয়া চালের ভাত, এক পোয়া ময়দার লুচী বা রুটী, দুই ছটাক ডাল, ও আধ সের দুধ খাইলেই স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য থাকিতে পারে। অধিক পরিশ্রম করিতে হইলে, ডালের পরিবর্ত্তে এক পোয়া মাংস খাইলে চলিতে পারে। পরিশ্রমও বয়স ভেদে আহারের পরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

এস্থলে দেশাচারের অনুবর্ত্তী হইয়া প্রত্যহ তিনবার আহার গ্রহণের অনুমোদন করা গেল, কিন্তু বাস্তবিক ইহাই যে প্রকৃতির নিয়ম এরূপ বলা যায় না। আমাদের দেশের বিধবারা দিনান্তে একবার অন্নগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় অনেক লোকে প্রত্যহ একবারের অধিক আহার করে না এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে কেহ কেহ অদ্যাপিও একাহারী আছেন। অনেকে প্রত্যহ দুই বারের অধিক আহার করেন না, এবং পূর্ব্বাহ্নে বা পরাহ্নে জল-

খাবার গ্রহণ করিলে তাঁহাদের অসুখ হয়। বাস্তবিকও মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু খাইলে পাকস্থলীকে বিশ্রাম দেওয়া হয় না, অনবরত কার্য্য করিতে করিতে উহা অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়।

অনেকে নিদ্রা হইতে উঠিয়াই কিছু আহার করেন, এরূপ করা নিতান্ত অন্যায়। আহারের কিছু পূর্ব্বে পরিমিত পরিশ্রম করিলে যেরূপ ক্ষুধার উদ্রেক ও পরে পরিপাক হয়, পরিশ্রম না করিয়া খাইলে সেরূপ কোনমতেই হয় না। আহারের অব্যবহিত পরে নিদ্রা গেলে অনেকের সুষুপ্তি হয় না, নানা প্রকার ক্লেশদায়ক স্বপ্ন উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার পূর্ব্বে রাত্রিকালের আহার সমাপন করিলে বৈকালিক জল খাবারের প্রয়োজন হয় না, এবং অন্ততঃ ৩।৪ ঘন্টাকাল পরে নিদ্রা যাইতে পারা যায়।

আমরা মাংস ভোজন না করিয়া অনায়াসে দীর্ঘজীবী হইতে পারি। যে সকল দ্রব্য আমাদের খাদ্য, তৎসমুদায়ে শরীররক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান সকল পাওয়া যায়, সুতরাং মাংস না খাইলে কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু সময় বিশেষে মাংস খাওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য হইয়া উঠে। যখন রোগ দ্বারা শরীর শীর্ণ হয়, তৎকালে অল্প পরিমিত দ্রব্যে অধিক পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এরূপ খাদ্য মনোনীত করা কর্ত্তব্য। দুগ্ধ, ডিম্ব ও মাংস ভিন্ন আর কোন দ্রব্যের দ্বারা এই প্রয়োজনসাধন হয় না। উদরাময় বা অম্লের পীড়া থাকিলে দুগ্ধে অপকার ভিন্ন

উপকার হইবার সম্ভাবনা নহে, এরূপ স্থলে মাংসই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমাদের দেশে যে কুৎসিত প্রণালীতে মাংস রন্ধন করা হয়, তাহাতে পীড়িত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, সহজ শরীরেও পরিপাক করা কঠিন হয়। শূল্য বা সিদ্ধ মাংসই রোগীর পথ্য; মসলা ও ঘৃত যুক্ত হইলেই গুরুপাক হয়। মেষমাংস লঘুপাক ও পুষ্টিকর।

আমাদের দেশে মাংসভোজনের বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু শীতপ্রধান দেশে ইহা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত। মনুষ্যের অসভ্যাবস্থায় পশু-মাংসই প্রধান জীবনোপায়, কোন কোন জাতি নরমাংসও খাইয়া থাকে। সভ্যতার বৃদ্ধি হইলে অন্যান্য দ্রব্য করতলস্থ হয়, তখন মাংসের ব্যবহার কমিয়া আইসে। বোধ হয়, কালক্রমে মাংসের ব্যবহার এককালে রহিত হইয়া যাইবে।

অনেক হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে মাংসের ব্যবহার নাই, এবং ইউরোপীয় কোন কোন লোকে মাংস পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমেরিকা দেশে বাইবল্ খ্রীষ্ট্যান্ নামক সম্প্রদায় মৎস্য, মাংস ও সুরা এককালে পরিহার করিয়াও সুস্থ কর্ম্মক্ষম আছেন। চীন, জাপান ও ভারতবর্ষের অতি অল্প লোকেই মাংস ভোজন করে।

মাংসাদ জীবগণ যেরূপ উগ্রস্বভাব শস্য-জীবীরা তাদৃশ নহে। যে দেশের লোকে সর্ব্বদা মাংস ভোজন করে, তাহাদিগকে অন্যান্য লোক অপেক্ষা ভীষণপ্রকৃতি বলিয়া

উপলব্ধি হয়। যতকাল সংসারে যুদ্ধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কার্য্য প্রচলিত থাকিবে, তত দিন শস্যজীবী শান্তপ্রকৃতি জাতিদের মাংস ভোজীগণের অধীনস্থ হইবারই সম্ভাবনা। প্রাচীন গ্রীক রোমান্, য়িহুদী, ও বর্ত্তমানকালের জর্ম্মান্, ইংরাজ প্রভৃতি জাতি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে মাংস ভোজন করিয়া, কতশত স্থানে যুদ্ধানল প্রদীপ্ত করিয়াছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। এই কি মনুষ্যের চরম অবস্থা? মাংস না খাইয়া কত লোক সবল, সুস্থ ও দীর্ঘজীবী হইতেছেন, এবং সর্ব্ব প্রকার মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমও অনায়াসে করিতেছেন, কিন্তু বল থাকিয়াও তাঁহারা নিষ্ঠুরতা ও দুঃসাহসিকতার কার্য্য করিতে পারেন না, সুতরাং মাংসভোজী ব্যক্তিরা রোষপরবশ হইয়া আক্রমণ করিলে সহসা তাহার কোন প্রতিবিধান করিতেও সক্ষম হন না। আমাদের দেশের কোন কোন ভদ্র-সন্তান সবল থাকিয়াও, রেলওয়ের গাড়ি অথবা অন্যান্য সাধারণ-সমাগম স্থানে, অতি ইতর ইউরোপীয়ের নিকট পরাভব স্বীকার করেন, এরূপ দেখা যায়। বাস্তবিক আমাদের দেশে কিয়ৎপরিমাণে সাহসিকতার প্রয়োজন হইয়াছে। মাংস ভোজনের প্রথা প্রচলিত হইলেই বোধ করি উপস্থিত উদ্দেশ্য সফল হইবে।

যাহারা অনুক্ষণ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করে, মাংস তাহাদের পক্ষে উপকারী। ইহা দ্বারা যত শীঘ্র দেহের ক্ষতিপূরণ ও বৃদ্ধিসাধন হয়, তত আর কিছুতেই

হয় না। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয় না, এবং মাংস ভক্ষণে ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির আতিশয্য হয় বলিয়া, বোধ হয়, শাস্ত্রকর্ত্তারা তাহাদিগকে মাংস খাইতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

চাল, গোম, এরোরুট, সাগু প্রভৃতি খাদ্য লঘুপাক ও পুষ্টিকর, এজন্য সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। কয়েক প্রকার ডাল, মাছ ও তরকারী আমাদের দেশে সচরাচর ব্যবহার হইয়া থাকে। এ সকল দ্রব্য রন্ধন দ্বারা সুন্দররূপে সিদ্ধ না হইলে পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত করে, অনেকে অপক্ক ডাল বা তরকারী খাইয়া কত রোগ ভোগ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল শরীরে ডালের সার পরিত্যাগ করিয়া ঝোল খাইলে চলিতে পারে।

তরকারীর মধ্যে কয়েক প্রকার আলু, কাঁচকলা, কাঠা-লের বিচি, ও মানকচু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সিদ্ধ আলু অপেক্ষা শূল্য আলু অথবা আলুর রুটী ভাল, কিন্তু ইহারা ভাত অপেক্ষা অধিক সময়ে জীর্ণ হয়। পটল, বার্ত্তাকু প্রভৃ-তির হরিদংশ কথনই পরিপাক হয় না, এজন্য তাহা পরি-ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর। আমরা যে সকল শাক ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাতে প্রায়ই সারাংশ নাই, এবং তাহার কঠিন ভাগ কখনই জীর্ণ হয় না, এজন্য তৎসমুদায়ই পীড়াদায়ক। তিক্তরসবিশিষ্ট যে যে শাক খাইতে হয়, তাহার ক্বাথ খাইয়াই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

শাকজাতীয় দ্রব্যের মধ্যে কপি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, কিন্তু ইহাও

পীড়াদায়ক। এতদ্দেশে অতি অল্প লোকেই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সিম, লাউ, কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি রোগী ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ। যে যে তরকারীতে হরিদংশ ও জলীয় ভাগ অধিক, তাহা ব্যবহার করিলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। ডুমুর, পটল, মোচা অনেক অংশে ভাল।

আমরা যে কয়েক প্রকার মৎস্য খাইয়া থাকি, তন্মধ্যে রোহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যে যে মৎস্যে তৈল বা জলের ভাগ অধিক, তাহাতে অপকার ভিন্ন উপকার নাই। তৈল অধিক থাকিলে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়, ও জলীয়ভাগ অধিক হইলে শরীরের উপকার হয় না। ক্ষুদ্র মৎস্য রোগীদিগের পক্ষে অনিষ্টকর নহে। ইহাতে তৈলের ভাগ অধিক না থাকাতে সহজে পরিপাক হয়। পচা মাছ রোগের মূলীভূত,ইহা নিতান্ত নিষিদ্ধ। কৈ, মাগুর, সিঙ্গি, মকল্লা, পাকাল প্রভৃতি মাচ রোগীকেও দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন মৎস্য জল হইতে তুলিয়া দীর্ঘকাল জীবিত রাখিয়া খাইলে আর তদ্রূপ উপকারী হয় না। ইলিশ মাচ উদরাময় রোগে নিষিদ্ধ। চিঙড়ী ও কাঁকড়া সহজে পরিপাক হয় না।

আমরা অনেক দ্রব্য তৈল দিয়া ভাজিয়া খাই। যে দ্রব্য সিদ্ধ করিলে অনায়াসে পরিপাক করা যায়, ভাজিলে তাহা উগ্র হইয়া উঠে। অতএব দুর্ব্বল শরীরে ভাজা জিনিষ খাওয়া অবৈধ। খাইলে অজীর্ণ, বুকজ্বালা প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত হয়।

দধি, অম্ল প্রভৃতি দ্রব্য সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে অপকার হয় না। লেবু, তেঁতুল প্রভৃতিতে বরং ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু অধিক পরিমাণে খাইলে রোগ জন্মে। জ্বরবিশেষে লেবু মহোপকারী। অম্ল যেরূপ মুখরোচক এরূপ আর দেখা যায় না। অম্লরস পান করিয়া কত লোকের অম্লপিত্তরোগ ও অজীর্ণদোষ এক কালে অন্তর্হিত হইয়াগিয়াছে।

মিষ্টান্ন খাইতে প্রায় সকল ব্যক্তিই ভাল বাসেন। এজন্য ইহা সকল দেশেই ব্যবহৃত। আমাদের দেশে ইক্ষু, খেজুর প্রভৃতি গাছের রস হইতে গুড় প্রস্তুত হয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া চিনি করিলে, তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার উৎকৃষ্ট মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইতে পারে। যে কোন দ্রব্যের সহিত চিনি মিশ্রিত করা যায়, তাহাই সুস্বাদ হইয়া উঠে। নারিকেল, ছানা, ক্ষীর প্রভৃতির সহিত চিনি মিশাইয়া কয়েক প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত হয়, ও ঘৃতপক্ব দ্রব্যাদি চিনির সংযোগে নূতন স্বাদযুক্ত হয়। চিনি সহজে পরিপাক হয়, কিন্তু আর আর দ্রব্য তত শীঘ্র জীর্ণ হয় না, এজন্য অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন খাওয়া নিষিদ্ধ।

গুড় অল্প পরিমাণে মধ্যে মধ্যে খাইলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না। ইহা পুষ্টিকর এবং ইহাতে নাড়ী পরিষ্কার থাকে। বালকেরা গুড় খাইতে ভাল বাসে, সপ্তাহে ২।৩ দিন অল্প করিয়া দিলে উপকার হইতে পারে। অধিক মিষ্টদ্রব্য খাইলে উদরাময়, কৃমি, ও দন্তের রোগ জন্মে।

নূতন মধু অতি মুখপ্রিয়। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত খাইলে ইহাতে উপকার আছে। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন সহ্য হইতে পারে। চিনি, গুড় ও মধু প্রায় শরীরের তাপউদ্ভাবনকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া যায়।

খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে কয়েক জাতীয় ফল অতি মনোহর, ইহাদের স্বাদ ও ঘ্রাণ এত উৎকৃষ্ট, ও এত অল্পকালের মধ্যে ইহারা জীর্ণ হয়, যে কি পীড়িত কি সুস্থ সকল অবস্থাতেই প্রায় ব্যবহার করা যায়। দাড়িম, লিচু, কমলালেবু, আতা, আনারস, আম্র, রম্ভা, কুল, পেয়ারা প্রভৃতি যে সকল ফল আমাদের দেশে সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাদের তুল্য বুঝি আর কোন দেশেই পাওয়া যায় না। কাঁঠাল, পেপিয়া, নারিকেল প্রভৃতি ফলও উত্তম, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প পরিমাণে ব্যবহার না করিলে অসুখ হয়। কোমল নারিকেল সহজেই পরিপাক হয়। আখ মুখরোচক বটে কিন্তু লঘুপাক নহে। নারিকেলের জল ও আখ পিপাসাকালে কখন কখন খাওয়া মন্দ নহে। ফুটী, তরমুজ, স্বসা, অল্প পরিমাণে খাওয়াই ভাল। ইহারা যেরূপ শীতল সেরূপ লঘুপাক নহে। পানিফল, কেসুর, শাঁকআলু প্রভৃতির রস খাওয়া মন্দ নহে। বেল উদরাময় রোগে বড় উপকারী। বৈদ্যেরা প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য সময়ে বেল খাইতে নিষেধ করেন।

আক্ষেপের বিষয় এই যে এত উৎকৃষ্ট ফল থাকিতে

অনেকে সময় অপেক্ষা করে না, অপক্কাবস্থায় ফল খাইতে আরম্ভ করে। শিশুগণের মধ্যে অনেকেই কাঁচা ফল খাইয়া উদরাময় রোগগ্রস্ত হয়, এবং কেহ কেহ অকালে মৃত্যু-গ্রাসে পতিত হয়। শিশুসন্তানদিগকে প্রচুর পরিমাণে সুপক্ক ফল সর্ব্বদা দেওয়া পিতা মাতার কর্ত্তব্য, তাহা হইলে আর কাঁচা ফল খাইতে তাহাদের প্রবৃত্তি জন্মে না।

বিদেশীয় ফল খাইবার তাদৃশ প্রয়োজন নাই, যে দেশে যেরূপ দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা উপস্থিতমত প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিদেশীয় ফলের মধ্যে কাবুল হইতে যে কয়েক প্রকার আসিয়া থাকে তাহা মন্দ নহে, কিন্তু তন্মধ্যে যে কয়েকটী তৈলময়, তাহা অধিক খাইলে পীড়া হইয়া থাকে। বেদানা, কিশ্‌মিশ্‌ প্রভৃতি রেচক দ্রব্য কখন কখন পীড়াদায়ক হয়।

দুগ্ধ সকল দেশে ও সকল সময়েই অল্প বা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত। ইহা অন্যান্য খাদ্যের আদর্শ স্বরূপ; বয়োবৃদ্ধি হইলে লোকে অল্প দুধ খাইয়াই তৃপ্ত হয়। ইহা ভাত অপেক্ষা অধিক কালে জীর্ণ হয়, এবং মাংসের সহিত খাইলে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। দুধ খাইলে সুনিদ্রা হয়, ইহা শিশুদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চিনি-মিশ্রিত দধি ও ঘোল স্বাস্থ্যপ্রদ। ঘৃতের ভাগ পৃথক্‌ করাতে ঘোল সহজে জীর্ণ হয়।

দুগ্ধোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঘৃত সর্ব্ব প্রধান, ইহা অনেক কার্য্যেই লাগিয়া থাকে। ছানা সহজে পরিপাক হয় না।

সরে ঘৃতের ভাগ অধিক, ইহা অল্প পরিমাণে খাওয়াই উচিত। অনেক পীড়াতে এ সমুদায় নিষিদ্ধ। উত্তাপ দ্বারা ক্রমে শুষ্ক করিলে, দুগ্ধ হইতে ক্ষীর উৎপন্ন হয়। ইহা অধিক খাইলে পীড়া হয়। ঘৃত অপেক্ষা মাখন সুস্বাদ ও সহজে পরিপাক হয়।

হংস প্রভৃতি কয়েকটী পক্ষীর ডিম্ব অনেকে ব্যবহার করিয়া থাকে। ভাজিবার বা সিদ্ধ করিবার সময়ে নিতান্ত কঠিন হইলে, ইহা গুরুপাক হইয়া উঠে। কিন্তু ৫ মিনিট কাল মাত্র অত্যুষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, অপেক্ষাকৃত সহজে পরিপাক হয়। কাঁচা ডিম সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হয়, কিন্তু খাইতে অনেকেরই শ্রদ্ধা হয় না। ডিমের বিশেষ পুষ্টিকারিতা গুণ আছে।

এতদ্দেশীয় জলখাবারের মধ্যে মুড়ি ও ভাজা চিঁড়ে অতি লঘু। ইহা অন্যান্য দ্রব্য অপেক্ষা সহজে পরিপাক হইতে পারে। নারিকেল সহকারে খাইলে ইহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। মুড়্‌কি প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য মুড়ির ন্যায় সহজে পরিপাক হয় না।

এতদ্দেশীয় পিষ্টকাদি প্রায়ই অনিষ্টকর। কিন্তু সুস্থ শরীরে অল্প পরিমাণে খাইলে বিশেষ পীড়াদায়ক হয় না। বাজারের মেঠাই, লুচী, কচুরী যেরূপ জঘন্য উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে পীড়া হইবার সন্দেহ নাই। এ সমুদায় যত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল।

অন্নমণ্ড, যবমণ্ড প্রভৃতি দুর্ব্বল ও পীড়িত শরীরে

বিশেষ উপকারী। অনেকে পীড়াকালে এ সকল খাইতে সঙ্কুচিত হইয়া, ভ্রমবশতঃ ডুমুর পটল মোচা প্রভৃতি খাইয়া পাকস্থলীকে দূষিত করিয়া ফেলেন। এ সকল দ্রব্য অপেক্ষা অন্নমণ্ড প্রভৃতি সহজে পরিপাক হয়।

তৃতীয় অধ্যায়।
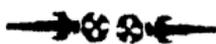
পানীয়।

মনুষ্য-শরীর যে যে উপাদানে নির্ম্মিত, তন্মধ্যে জলই প্রধান। যে রক্ত প্রবাহিত হইয়া শরীরের ক্ষতি পূরণ করে, তাহার অন্যূন ৪/৫ ভাগ বিশুদ্ধ জলমাত্র। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, আমাদের সমুদায়শরীরের ২/৩ ভাগ বিশুদ্ধজলমাত্র। শরীরে যে পরিমাণে জল থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে সমস্ত শারীরিক কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, কোন কারণবশতঃ তাহার অল্পতা হইলেই আমাদের পিপাসা উপস্থিত হয়, তাহাতেই আমরা জল পান করি। জল পান করিলে সেই পিপাসা নিবারিত হয়, তখন শারীরিক কার্য্যসকল অব্যাহতরূপে চলিতে থাকে। পিপাসাকালে জল না পাইলে যে ভয়ানক ক্লেশ হয়, তাহা সকলেই অবগত আছেন। ফলতঃ অনাহারে বরং কয়েক

দিন জীবিত থাকা যায়, কিন্তু জলপান না করিলে অতি ত্বরায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে। যাহারা প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া অনশনে জীবন ত্যাগ করে, পিপাসাই তাহাদিগকে সমধিক যাতনা দেয়; এমন কি, তাহাদের তৎকালোক্ত কাতর-বচন শুনিয়া পাষাণহৃদয়ও আর্দ্র হয়। এমত সময়ে তাহারা বৃষ্টির জলবিন্দু পাইয়াও সতৃষ্ণনয়নে জিহ্বাবিস্তারপূর্ব্ব তাহাই পান করিয়া ও তাহাতে শয়ন করিয়া কত তৃপ্তি অনুভব করে তাহা বর্ণনাতীত। এরূপ অল্প পরিমাণে জল পাইয়াও কয়েক দিবস পর্য্যন্ত মৃত্যু-হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়া থাকে। বাস্তবিক জল যে জীবন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে তাহা অযথার্থ নহে।

আমাদের ত্বক্ ফুস্‌ফুস্ প্রভৃতির কার্য্যদ্বারা নিয়ত শরীর হইতে জল বহির্গত হইতেছে। শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক জল পান করিতে হয়। আমরা স্নান করিলে ত্বকের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা শরীরে জল প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে পিপাসানিবারণ হয়।

আমরা যে সকল দ্রব্য আহার করি, তৎসমুদায় পাক-যন্ত্রে দ্রবীভূত হইলে পরিপাককার্য্য হইতে থাকে। শরীরে জলীয় পদার্থের অল্পতা হইলে খাদ্য দ্রবীভূত হইতে পারে না, সুতরাং পরিপাককার্য্যের ব্যাঘাত জন্মে। জল যেমন দ্রাবক এমন আর দেখা যায় না। অজীর্ণদোষ হইলে উপযুক্ত পরিমাণে জল পান করিলে যে বিলক্ষণ উপকার হয় তাহার বিশেষ কারণ এই।

পিপাসা হইলেই জল পান করা উচিত। যে পরিমাণে পান করিলে পিপাসা শান্তি হয়, তাহার অধিক খাইলে পীড়া জন্মে। কিন্তু অতিভোজন যেমন অনিষ্টকারী, অতিপান তত দোষাবহ নহে। অতিরিক্ত জলীয় ভাগ অতিশীঘ্রই ঘর্ম্ম ও মূত্ররূপে বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু ঘর্ম্মাদির আতিশয্যবশতঃ ক্লেশ হইয়া থাকে।

ক্ষুধাসময়ে, যেমন ধীরে ধীরে আহার করিলে ক্ষুধা-শান্তি হইল কি না, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়, সেই রূপ পিপাসা হইলে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া জল খাইলে পিপাসানিবারণ হইল কি না, অনায়াসে তাহার উপলব্ধি হয়। যেমন আহার করিবা মাত্র ক্ষুধাজনিত ক্লেশ যায় না, সেইরূপ জল পান করিবা মাত্র পিপাসাও অন্তর্হিত হয় না। যে পর্য্যন্ত পীতবারির কিয়দংশ শরীরের কার্য্যে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ পিপাসাজনিত ক্লেশ অন্তর্হিত হইবার নহে। জল প্রভৃতি তরল পদার্থ আমাশয়ের সংলগ্ন নাড়ীবিশেষদ্বারা শোষিত হইয়া শীঘ্রই শরীরের কার্য্যে লাগে।

যখন পরিশ্রম করিতে করিতে ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, তৎকালে শীতল জল পান করা অবৈধ। ঘর্ম্ম-নিঃসরণ-কালে, ত্বগভিমুখে রক্তের গতি হয়। শীতল জল পান করিলে, সহসা সেই গতির ব্যাঘাত হয়; তাহাতে ত্বগভি-মুখে-ধাবিত-রক্ত প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, হৃদয়, ফুস্‌ফুস্‌ বা পাকযন্ত্রে গমন করিয়া তাহাদের পীড়া উৎপাদন করে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে ভুক্তদ্রব্য কয়েক প্রকার শারীরিক রসের সহিত সংমিলিত হইয়া জীর্ণ হয়। কোন রূপে এই সংমিলনের ব্যাঘাত হইলে, পরিপাক কার্য্যের ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। বাস্তবিকও তাহাই ঘটিয়া থাকে। আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে বা আহার-কালে অত্যন্ত অধিক জল খাইলে, পাচক রস-সকল জল-সংযোগে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন তাহাদের দ্বারা সুন্দররূপে পরিপাক হয় না। এজন্য তৎকালে অধিক জল পান করা নিষিদ্ধ।

কোন উষ্ণ দ্রব্য পান বা ভোজন করিবার অব্যবহিত পরে, শীতল জল খাইলেও অনিষ্ট হয়। উষ্ণ দ্রব্য খাইলে, সমুদায় শারীরিক কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইতে থাকে, ঘর্ম্মাদি নিঃসরণও হয়, এরূপ সময়ে শীতল জলপান করিলে ত্বক্ বা পাকযন্ত্রাভিমুখে-ধাবিত রক্ত সহসা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া, শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র-বিশেষে গমন করিয়া, পীড়াদায়ক হইতে পারে। এই নিয়ম না বুঝিয়া অনেকেই কফ, কাশ প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকেন।

যে জল আমাদের শরীররক্ষার একটী প্রধান সাধন, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না। অনেক স্থানের লোকেই পঙ্কিল, তৃণলতা-পূর্ণ, বৃক্ষাচ্ছাদিত পূতিগন্ধ-বিশিষ্ট পুষ্করিণীর জল পানকরিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। কোন কোন গ্রামের নিকটস্থ নদী বা বিলের জলও অপকৃষ্ট। এরূপ জলে নানা প্রকার

দূষিত পদার্থ মিশ্রিত থাকাতে তাহা পীড়াদায়ক হয়। ইহা শোধন করিবারও সহজ উপায় আছে।

উপর্য্যুপরি চারিটী কলসী স্থাপন করিয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে রাখিবার নিমিত্ত কাটের বা বাঁশের ফ্রেম প্রস্তুত করিতে হয়। তাহার প্রতিরূপ অপর পৃষ্ঠায় চিত্রিত হইল। প্রথমতঃ জল উত্তপ্ত করিতে হয়, তাপসংযোগে ইহার কয়েক প্রকার দূষিত বাষ্প বহিষ্কৃত হয়। সেই জল উপরের কলসীতে ঢালিতে হয়। তাহার নীচে ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া ইহা ক্রমশঃ ২য় কলসীতে পড়ে। ২য় ও ৩য় কলসী অঙ্গার-চূর্ণ ও বালুকাতে পরিপূর্ণ; ইহাদেরও তলায় ছিদ্র আছে। সকলের নীচের কলসীর মুখে মোটা কাপড়ের আবরণ রাখিতে হয়, এই কলসীতে আর ছিদ্র নাই। ২য় ও ৩য় কলসী দিয়া গমনকালে জলের দূষিত অংশ অঙ্গার ও বালুকা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া থাকে; সুতরাং সকলের নীচের কলসীতে যে জল উপনীত হয়, তাহা প্রায়ই বিশুদ্ধ, তাহা কোন মতে পীড়াদায়ক হয় না। এই জলের স্বাদ সামান্য উষ্ণ জলের স্বাদের ন্যায় অপকৃষ্ট নহে। বিশোধন করিবার সময়ে ইহাতে বাহিরের বায়ু পুনঃপ্রবেশ করে, তাহাতে ইহার স্বাভাবিক স্বাদ উৎপন্ন হয়।

যে নদী বা পুষ্করিণীর তলা বালুকাময়, ও যাহাতে সর্ব্বদা বায়ু ও রৌদ্র লাগিয়া থাকে, এরূপ স্থানের জল প্রায়ই বিশুদ্ধ। কিন্তু স্নান ও গাত্রমার্জ্জনকালে তাহাতে
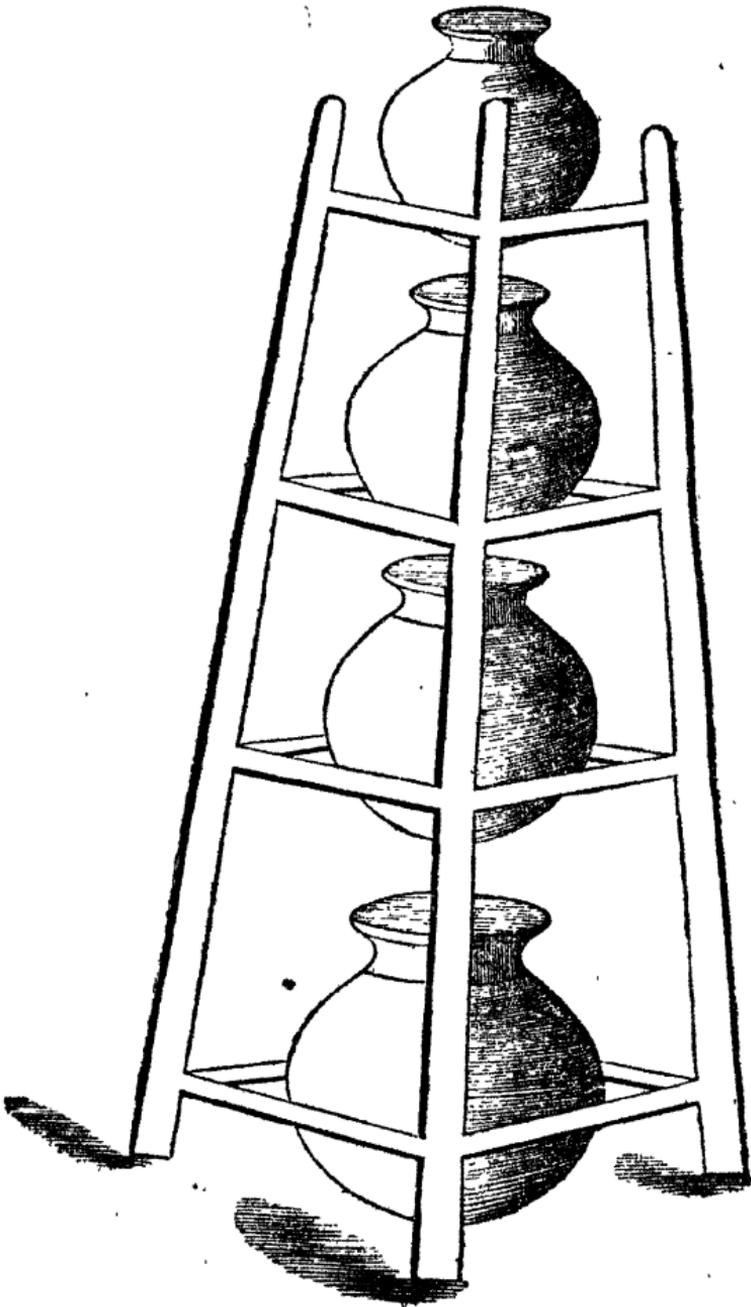
নানা প্রকার দূষিত পদার্থ যোজিত হইয়া তাহাকে পীড়া-দায়ক করিয়া ফেলে। যে নদীতে স্রোত আছে, তাহার জলই উৎকৃষ্ট, কিন্তু বর্ষাকালে তাহাতে নানা পদার্থ মিশ্রিত হয়। তখন পূর্ব্বোপায়ে বিশোধন না করিলে ইহা পীড়াদায়ক হইতে পারে। কোন কোন নদী সমুদ্র-সন্নিহিত; তাহাদের জল ব্যবহার্য্য নহে।

এক্ষণে এদেশের অনেকে আর জলপান করিয়া পরি-তৃপ্ত হন না। ইংরাজ জাতির সংসর্গদোষে তাঁহারা সুরাসক্ত হইতেছেন। যে সকল মহৎগুণে ইংরাজেরা অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম হইয়াছেন, যাহার প্রভাবে তাঁহারা পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে মাননীয় হইয়াছেন, তৎসমুদায়ের অনুকরণে অসমর্থ হইয়া অনেকে তাঁহাদের জঘন্য সুরাসক্তিরই অনুকারী হইতেছেন। সুরাপানে ইংলণ্ডে যে সকল মহানিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠ করিয়াও তাঁহারা ইহা হইতে পরাঙ্মুখ হন না। সুরাসক্ত ব্যক্তিরা সকল প্রকার কুক্রিয়াই করিতে পারে। যদি কেহ নরাকৃতি পশু দেখিবার অভিলাষ করেন, তাহা হইলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পর কলিকাতা নগরীর লালবাজার প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া ইংরাজ গোরা-দিগকে দেখিলেই পূর্ণমনস্কাম হইবেন। যে সকল কার্য্যে মনুষ্যনামের অবমাননা হয়, তৎসমুদায়ই সুরাসক্ত লোকের সাধ্য। অল্পকালের মধ্যেই এদেশের কত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিশিষ্ট উদারস্বভাব ব্যক্তি সুরাপান করিয়া

কালকবলে পতিত হইয়াছেন, ও কতজন কত গর্হিত ক্রিয়া করিয়াছেন ও করিতেছেন. তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন সুস্থ শরীরে সুরা বিষতুল্য। ইহা পান করিলে, নানা প্রকার অচিকিৎস্য রোগ উপস্থিত হয়। উদরাময়, যকৃৎ, শ্বাস, কাশ প্রভৃতি ভয়ানক রোগ-পরম্পরা অতি অল্প কালের মধ্যেই দেখা দেয়, ও পরিশেষে প্রবল হইয়া জীবন হরণ করে। ইংলণ্ড প্রভৃতি শীত প্রধান দেশে এই সকল ফল কিছু বিলম্বে হয়, কিন্তু এতদ্দেশে অতি অল্পকালের মধ্যেই প্রকাশ পাইয়া উঠে।

সুরা উদরস্থ হইবা মাত্র, তত্রত্য শিরা সমূহ দ্বারা শোষিত হইয়া রক্তের সহিত মিলিত হয়, এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্ব শরীরে চালিত হইয়া প্রথমতঃ স্নায়ু-যন্ত্র ও মস্তিষ্ক আক্রমণ করে। একটী কুকুরকে দেড় ছটাক সুরাপান করাইবা মাত্র তাহার মৃত্যু হইয়াছিল। পরে কয়েক মিনিটের মধ্যে তাহার দেহ ব্যবচ্ছেদ করিলে দেখা গেল যে শরীরের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা মস্তিষ্কে অধিক পরিমাণে সুরা উপস্থিত হইয়াছে। যেমন মস্তকে যষ্টি প্রহার করিলে সহসা চৈতন্য হরণ ও মৃত্যু হইয়া থাকে, অধিক পরিমাণে সুরাপান করিলেও তদ্রূপ ঘটে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা সচরাচর নিতান্ত অধিক পরিমাণে পান করে না, তাহাতে আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু পান করিতে করিতে তাহাদিগেরও মস্তিষ্ক ও স্নায়ু-যন্ত্র আর

বুদ্ধিশক্তির বশীভূত থাকে না, ও অধিক পান করিলে এককালে অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় হিতাহিত জ্ঞান দূরে থাকুক, শরীরে আঘাত লাগিলেও তাহাতে চেতনা হয় না। তখন আর মনুষ্য পশুতে প্রভেদ থাকে না। কেহ এরূপ অবস্থায় পতিত হইলে, শৈত্যক্রিয়া দ্বারা তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে হয়।

অল্প পরিমাণে সুরাপান করিয়া যেরূপে মত্ততা উপস্থিত হয় এক্ষণে তাহারই বর্ণন করা যাইতেছে। অল্পপান কালে প্রথমতঃ মস্তিষ্ক উত্তেজিত হয়, মনোবৃত্তি প্রখর হইতে থাকে, নানাবিধ আমোদ প্রমোদের কথা ও দুর্বোধ বিষয়ের আলোচনার ইচ্ছা হয়, কিন্তু জ্ঞানের শাসন আর তাদৃশ লক্ষিত হয় না। হৃদয়ের কার্য্য ও রক্তসঞ্চালন সত্বর হইতে থাকে, সমস্ত শরীর উত্তপ্ত, বলিষ্ঠ এবং সুস্থবোধ হয়। পরে আরও পান করিলে দর্শন ও শ্রবণ জ্ঞানের বিকৃতি জন্মে, হস্তপদ বলহীন ও কম্পান্বিত হয়, মস্তক ঘূর্ণায়মান হয় ও জিহ্বা দ্বারা স্পষ্টরূপে বাক্যনিঃসরণ হয় না। তখন মস্তিষ্কের উত্তেজনা বৃদ্ধি পাইয়া উন্মত্ততার লক্ষণ আবির্ভূত হয়, এবং জ্ঞানের শক্তির লাঘব হইয়া পড়ে। মনুষ্যত্বের হ্রাস হইয়া পশুত্বের বৃদ্ধি হইতে থাকে। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া উঠে, এবং অতিভদ্রপ্রকৃতি ব্যক্তিও উন্মত্ত প্রায় হইয়া যায়। এরূপ অবস্থায় শরীর ও মন নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হয়, তখন মোহসদৃশ নিদ্রা উপস্থিত হইয়া দুর্ব্বহভারাক্রান্ত ব্যক্তিকে

কিছুকালের নিমিত্ত কষ্ট হইতে মুক্ত করে। কিন্তু সে নিদ্রা সুখপ্রদায়িনী নহে। পরদিন এত দৌর্ব্বল্য অনুভূত হয় যে তাহা নিবারণজন্য পুনরায় সুরাপান করা আবশ্যক হইয়া উঠে।

দীর্ঘকাল সুরাপান করিলে মুখশ্রী অপকৃষ্ট হইয়া যায়, শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, চক্ষুর্দ্বয় সততই রক্তবর্ণ থাকে, নাসিকাগ্র লোহিত বর্ণ ও স্ফীত হয়, ও অজীর্ণ দোষ উপস্থিত হয়। সমস্ত শরীর কাঁপিতে থাকে, দর্শন ও শ্রবণের ব্যতিক্রম ঘটে, সমস্ত ত্বক্ নানা রোগাক্রান্ত হয়, দৌর্ব্বল্য বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুনিদ্রা হয় না, ক্ষুধা অন্তর্হিত হয়, সর্ব্বদা বমন হইতে থাকে, হস্তপদ চমকিয়া উঠে, বুদ্ধিবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে কোন না কোন প্রবল রোগ উপস্থিত হইয়া মৃত্যুকে আহ্বান করে। পাকযন্ত্র, যকৃৎ, মস্তিষ্ক, ত্বক্, মূত্রাশয়, হৃদয় প্রভৃতি যন্ত্রের পীড়া উপস্থিত হইয়া মাতালকে পরলোকে প্রেরণ করে। সুরাপানে মস্তিষ্কের যেরূপ ভয়ানক বিকৃতি হয় এস্থলে তাহারই একটী উদাহরণ উদ্ধৃত করা গেল।

ডাক্তার মিলার লিখিয়াছেন, "অর্দ্ধ-বয়স্ক একটী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কয়েক বৎসর সুরাপান করিয়া কয়েক বার এই ভয়ানক রোগাক্রান্ত হন, তাহাতে তাঁহার জীবন-সংশয় হয়। আমি সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম তিনি লম্ফ প্রদান করিতে করিতে গৃহস্থিত একখানি

চৌকী হইতে আর একখানিতে যাইতেছেন; তাঁহার ভ্রম হইয়াছে, যেন গালিচার উপরে সহস্র সহস্র সর্প ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে। সুতরাং ঊর্দ্ধে লম্ফ দিয়া না বেড়াইলে তাঁহার আর রক্ষা নাই। কিয়ৎক্ষণ পরেই ভাবান্তর উপস্থিত হইল; শাণিত ছুরিকাধারী পুরুষেরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে ভাবিয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে লাগিলেন, ক্ষণকাল মধ্যেই আবার একলম্ফে শয্যায় আগমন করিয়া, অতিশান্তভাবে হস্তপদ স্থাপন করিলেন, তখন অতি মৃদুভাবে নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তৎকালে আমাদিগকে কহিলেন, আমি মরিয়াছি, এবং স্বীয় মৃত্যু সংবাদ যেন একটী সংবাদপত্র হইতে পাঠ করিতেছেন এইরূপ ভান করিয়া কহিলেন, ' আমার বন্ধুবর্গেরা এই সংবাদ অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন"। পরে কিয়ৎকাল স্থিরভাবে থাকিয়া, সহসা শয্যা হইতে উঠিয়া, নিকটস্থ উপবেশন--গৃহে গমন করিলেন, এবং কাগজ লইয়া কম্পিত হস্তে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, আমার উইলের ক্রোড়পত্র লিখিতে ভুলিয়াছিলাম, এক্ষণে সময় পাইয়া লিখিতেছি। যাহা লিখিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আমি অমুক তারিখে মরিলাম, আমার নিয়োগকর্ত্তারা যেন অনুগ্রহ করিয়া আমার পুত্রকে আমার পদে নিযুক্ত করেন। তৎপরে শয়ন-গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং স্বীয় শয্যা দেখিয়া, পরিচারকেরা তাঁহার মৃতদেহ অপহরণ করিয়াছে ভাবিয়া, তাহাদিগকে যৎ-

পয়োনাস্তি তিরস্কার করিতে লাগিলেন। "কোথায় রাখিয়াছিস্? কোথায় রাখিয়াছিস? আমি যখন উইলের ক্রোড়পত্র লিখিতে উপবেশন-মন্দিরে গিয়াছিলাম, তৎকালে কোন দুষ্টলোক ইহা দূরীভূত করিয়াছে। শীঘ্র আনিয়া দে"। এইরূপে পুনরায় উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। পরে ক্রমে চৈতন্য রহিত হইয়া গেল, স্থিরভাবে পুনরায় শয়ন করিলেন। রোগ উপশমের নিমিত্ত যে সমস্ত চিকিৎসা করা হইয়াছিল, সকলই বিফল হইয়া গেল। কিছুতেই তাঁহাকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিল না।

এদেশে সুরা ব্যতীত আরও নানা প্রকার মাদকদ্রব্য প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে সিদ্ধি, আফিং, গাঁজা ও চরস প্রধান। এই কয়েকটীর যোগে নানা প্রকার মাদক প্রস্তুত হয়। এ সমুদায়ই অনিষ্টকারী; ইহাদের বশীভূত হইলে নানা রোগ ও অকালমৃত্যু হইয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই, যে এদেশের অনেকে মদ্যের ন্যায় এসমুদায়কে ঘৃণা করে না।

পীড়া হইলে চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে সকল প্রকার মাদক দ্রব্যই গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু চিকিৎসকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ মাদকপ্রিয়, যে অনেক পীড়াতেই অবৈধ পরিমাণে ইহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। এরূপ লোকের কথায় বিশ্বাস করা কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নহে। কত ব্যক্তি পীড়াকালে মাদক সেবন

আরম্ভ করিয়া, অল্প দিনের মধ্যে ভয়ানক মাদকাসক্ত হইয়াছেন, ও পরিশেষে নানাবিধ পাপপঙ্কে পতিত হইয়া অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার সঙ্খ্যা করা যায় না। অতএব পীড়াকালেই বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যাহারা মাদক সেবনে একান্ত রত, তাহা-দিগের মধ্যে অনেকেই প্রথমতঃ পীড়ার অনুরোধে এরূপ বিষভক্ষণ অভ্যাস করিয়াছেন; পরে জীবন পরিত্যাগও শ্রেয়স্কর বিবেচনা করেন, তথাপি মাদক ত্যাগ করিতে পারেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

বায়ু।

খাদ্য বা পানীয় অভাবে কয়েক দিবস জীবন ধারণ করা যাইতে পারে, কিন্তু বায়ু-রোধ হইলে ক্ষণকাল মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয়। যাহারা জলমগ্ন হয় বা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্পের সহিত শরীরের পরিত্যক্ত দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বাষ্পের বিনিময় না হওয়াতেই তাহাদের মৃত্যু হইয়া থাকে। যে অঙ্গার দাহন করিয়া আমরা রন্ধনাদি করিয়া থাকি, তাহাতে বায়ুস্থ অম্লজান বাষ্পের যোগে, দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প উৎপন্ন হয়। অম্লজান বাষ্পের পরিবর্ত্তে ইহা নিশ্বাস দ্বারা শরীরে গৃহীত

হইলে প্রথমতঃ নানা প্রকার অসহ্য ক্লেশ, ও অল্পকাল মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি ইহা গ্রহণ করিয়া আত্মঘাতী হইয়াছে, ও ইহাতে ক্রমে ক্রমে যে রূপে নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে, তাহা লিপিবদ্ধ করিতেও ত্রুটি করে নাই। তাহাদের বিবরণ পাঠ করিলে চিত্ত অস্থির হয়।

যে দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বায়ুর অপকারিণী শক্তির উল্লেখ করা গেল, সেই বাষ্প আবার আমাদের শরীরেই উৎপন্ন হইতেছে। নিশ্বাসদ্বারা বায়ু গ্রহণ করিলে, ইহার অম্ল-জান বাষ্প ফুস্‌ফুস্‌ পথে শরীরে প্রবিষ্ট হয়, ও তাহার বিনিময়ে শরীরস্থ দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বাষ্প প্রভৃতি পদার্থ বাহির হইয়া যায়। অম্লজানবাষ্পদ্বারা শরীরের অভ্যন্তরের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং কোন মতে তাহা শরীরে প্রবেশ করিতে না পারিলে অপকার হয়। নিশ্বাস-রোধ হইলে শুদ্ধ যে এই সকল কার্য্য রহিত হয় এরূপ নহে; শরীরস্থ দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বায়ু শরীরেই থাকিয়া যায় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে প্রথমতঃ সংজ্ঞাহরণ, ও ৫।৬ মিনি-টের মধ্যে জীবন শেষ করিয়া ফেলে। বায়ু অভাবে এই রূপেই মৃত্যু হইয়া থাকে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, বিশুদ্ধ বায়ুর ৫০০০ ভাগের দুই ভাগ দ্ব্যম্ল-অঙ্গারক বাষ্প; কিন্তু প্রশ্বাস দ্বারা ফুস্‌ফুস্‌ হইতে যে বায়ু নির্গত হয়, তাহার ১০০ ভাগে ৪।৫ ভাগ উক্ত বাষ্প পাওয়া যায়।

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু বাহির হয়, তাহা পুনরায় গ্রহণ করা অনুচিত। পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলে তাহাতে অশেষ ক্লেশ ও মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সময়ের অন্ধকূপ হত্যার বিবরণ অনেকেই অবগত আছেন। অতি সঙ্কীর্ণ স্থানে বহু লোক একত্র হওয়াতে, কয়েক ঘন্টা গত হইতে না হইতে ১৪৬ জনের মধ্যে ২৩ জন ভিন্ন আর কেহই জীবিত ছিল না। ইহারা পুনঃ পুনঃ প্রশ্বসিত বায়ু গ্রহণ করিয়া, যে ভয়ানক যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত।

নির্ম্মল বায়ু সেবন না করিলে আমাদের শরীরের সবিশেষ অনিষ্ট হয়, তদ্বিষয়ে এক্ষণে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন সঙ্কীর্ণ গৃহে বহুসংখ্যক লোক সমাগত হইলে মন কিরূপ নিস্তেজ ও নিরানন্দ হয়, তাহা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকিবেন। তখন সহসা বাহিরের বিমল বায়ুতে উপস্থিত হইলে, কি অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তি, কি সর্ব্বাঙ্গীন সুখ অনুভূত হয়। বিশুদ্ধ বায়ু-সেবন-সুখ হইতে বঞ্চিত হওয়া নিতান্ত কষ্টকর। পূর্ণ-বয়স্কলোকেরা প্রত্যহ অন্ততঃ ৪ ঘন্টাকাল বাহিরে থাকিলে সুস্থ থাকিতে পারে, কিন্তু শিশু ও বালকেরা অপেক্ষাকৃত অধিককাল বায়ুসেবন না করিলে রুগ্ন হইয়া পড়ে। যাহারা বাহিরের শীতল বায়ুতে পীড়া হইবে ভাবিয়া শিশুদিগকে সতত গৃহে অবরুদ্ধ রাখে, তাহাদের কি ভ্রম; তাহারা নির্ব্বুদ্ধিতা দোষে কত শত শিশুর জীবননাশের পথ

করিতেছে। অভ্যাস থাকিলে শীতল বাতাসে কোন পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং তাহা স্বাস্থ্যও সামর্থ্য-প্রদ।

এদেশে অনেক পল্লীগ্রামেই বিশুদ্ধ বায়ু অল্পায়াসে পাওয়া যায়, কিন্তু কলিকাতা প্রভৃতি নগরে ইহা নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতার কোন কোন প্রশস্ত রাজবর্ত্মে সুন্দর রূপে বায়ুসঞ্চালন হয় বটে, কিন্তু নগরের বায়ু অনেক সময়ে দূষিত পদার্থের সহিত মিলিত থাকে। অনেকে গাড়ি ঘোড়ার ভয়ে শিশুদিগকে রাস্তায় বাহির হইতে দিতেও পারে না। সুতরাং দুর্ভাগ্য শিশুগণ প্রতিনিয়ত গৃহের অভ্যন্তরে থাকিয়া যায়। গৃহ সকল আবার স্থানাভাবে নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে বহু পরিবারের বাস; এজন্য বালকেরা স্বভাবসিদ্ধ আমোদ প্রমোদ করিতে পারে না। অতএব বৃহৎ রাজধানীতে বাস করিয়া বায়ু সেবনাভাবে বহুসংখ্যক শিশুসন্তান রুগ্ন হইয়া পড়ে, ও অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে গমন করে।

কলিকাতার অনেক পাঠশালার গৃহে বায়ুসঞ্চালনের উপায় নাই, এরূপ স্থানে ২।৩।৪ বা ৫ শত বালক একত্র হওয়াতে অনেক পীড়ার আতিশয্য হইয়া থাকে। কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট সংক্রান্ত যে কয়েকটী বিদ্যালয় আছে, তাহার মধ্যে হেয়ার সাহেবের স্কুল, আহিরীটোলার বিদ্যালয়, ও শ্যামবাজারের বাঙ্গালা পাঠশালা এবিষয়ে

অপকৃষ্ট *। মফঃসলে ইষ্টক গৃহ নাই, ও স্থানেরও অপ্রতুল নাই, এজন্য তথায় বায়ু অভাবে পীড়া হইবার সম্ভাবনা নাই। স্কুলের অধ্যক্ষগণের অজ্ঞতা দোষে মফঃসলের কোন কোন বিদ্যা-গৃহে বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই।

গৃহের বাহিরে সর্ব্বদা বায়ু সঞ্চরণ করিতে থাকে। এরূপ স্থানে বহুসঙ্খ্যক লোক সমাগত হইলে কোন ক্ষতি নাই; কারণ বায়ুযোগে প্রশ্বসিত অঙ্গারক বাষ্প ইতস্ততঃ চালিত হইয়া যায়। কিন্তু গৃহমধ্যে বা আবৃত স্থানে অধিক লোক একত্র হইলে, নানা অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। আমাদের বাসগৃহ যে কদর্য্য প্রণালীতে নির্ম্মিত, তাহাতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় নাই, হয়ত বায়ু-প্রবেশের পথই থাকে না। একে গৃহাদি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, তাহাতে আবার রাত্রিকালে অনেকে একগৃহে শয়ন করিয়া থাকেন। গৃহে হয়ত জানালা নাই, থাকিলেও তাহার সম্মুখে ঋজু জানালা না থাকাতে, বায়ু গমনাগমন হয় না। গ্রীষ্ম-কালে গবাক্ষাদি খোলা থাকে, তাহাতে কিয়ৎ পরিমাণে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু শীতকালে তাহার কোন উপায়ই থাকে না। অভ্যাসদোষে এরূপ গৃহে বাস করাতে কোন উপস্থিত কষ্ট দেখা যায় না বটে, কিন্তু

* এক্ষণে অপেক্ষাকৃত ভাল স্থানে এই সকল বিদ্যালয়ের কার্য্য হইতেছে, কিন্তু সকল দোষগুলি যায় নাই। ১৮৬৯ খৃঃ অ।

তাহাতে শরীর দুর্ব্বল হয় ও নানা রোগের সূত্রপাত হইয়া থাকে।

আমাদের বাসগৃহ প্রশস্ত হওয়া উচিত। প্রশস্ত গৃহে ২।৩ জন বাস করিলে কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু এরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। সঙ্কীর্ণ গৃহে বাস করিতে হইলে, জানালা ও দুয়ার ব্যতীত অন্ততঃ তাহার চারিদিকের দেয়ালের ঊর্দ্ধ্ব ও অধঃ দিকে পরস্পর ঋজু ৮টী ছিদ্র রাখা উচিত। ছিদ্র দীর্ঘে ৪ ইঞ্চ ও প্রস্থে ৪ ইঞ্চ হইলেই, তদ্দ্বারা দূষিত বায়ু বহির্গত ও বিশুদ্ধ বায়ু প্রবিষ্ট হইতে পারে। প্রশ্বসিত দ্বাঙ্গ অঙ্গারক বাষ্প, বায়ু অপেক্ষা ভারী, এজন্য ইহা ভূতলে অবস্থিত হয়, ত্বক্ প্রভৃতি হইতে অন্যান্য যে সকল বাষ্প নির্গত হয়, তৎসমুদায় বায়ু অপেক্ষা লঘু, এজন্য তাহারা ছাদের দিকে গমন করে। দেয়ালের ঊর্দ্ধ্ব ও নিম্নভাগে ছিদ্র থাকিলে উভয় প্রকার বাষ্পই বাহির হইয়া যাইতে পারে। যে সকল গৃহের ছাত অধিক উচ্চ তাহাদের ছাতের দিক হইতে বায়ু সঞ্চালনের উপায় রাখা উচিত। উত্তপ্ত বায়ু ছাতের দিকেই ধাবমান হয়।

তৃণ, লতা, ও মৃত শরীর, নিয়ত জল বায়ু ও রৌদ্রযোগে পচিয়া যায়, তাহা হইতে নানা প্রকার বাষ্প উত্থিত হইয়া বাহ্য বায়ুকে অনুক্ষণ দূষিত করে। অসহ্য দুর্গন্ধ দ্বারা আমরা মধ্যে মধ্যে এই সকল অনিষ্টকর পদার্থের অস্তিত্বের পরিচয় পাইয়া থাকি; কিন্তু কখন

কখন তাহারা ইন্দ্রিয়বিশেষের অগ্রাহ্য থাকিয়াও, রোগ, মৃত্যু ও শোক-জনিত হাহাকার ধ্বনি বিস্তার করিয়া থাকে। আর্দ্র ও জলাকীর্ণ ভূমি হইতেই এই সকল ভয়ানক অনিষ্টকারী পদার্থ অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমাদের দেশে যে সকল স্থানে মারীভয় হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অনেক গ্রামই স্রোতোবিহীন নদী বা বিলের সন্নিহিত, অথবা তত্তৎ গ্রামে দুর্গন্ধময় পুষ্করিণী ও গর্ত্তের সংখ্যা অধিক। মারীভয়ের প্রকৃত কারণ কি, তাহা নির্দ্দেশ করা সহজ নহে, কিন্তু আর্দ্র ও জলাকীর্ণ স্থানে বাস, ও শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করাতে যে তাহার প্রাদুর্ভাব হইতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। পূর্ব্বকালে নদী খাল প্রভৃতি দ্বারা বর্ষার জল বহির্গত হইবার যেরূপ উপায় ছিল এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটাতে অনেক অনিষ্ট হইতেছে।

এদেশের অনেক প্রাচীন গ্রামে বাটীর নিকট বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি থাকাতে বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়; অনেক স্থানে গৃহাদি পরস্পরের নিতান্ত সন্নিহিত থাকিয়া বায়ুরোধ করে। বায়ুরোধ না করিতে পাইলে বৃক্ষদ্বারা অন্য কোন রূপ অনিষ্ট হয় না। এদেশে বৃক্ষাদি চিরকালই আছে, কিন্তু রোগের প্রাদুর্ভাব অল্প দিন হইল হইয়াছে।

দিবসে রৌদ্র পাইলে বৃক্ষাদির পত্র হইতে অম্লজান বাষ্প নির্গত হয়, কিন্তু রাত্রিকালে তৎপরিবর্ত্তে অঙ্গারক বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। শয্যা-গৃহের অভ্যন্তরে বা নিকটে পুষ্প. বৃক্ষশাখা বা লতাপত্রাদি রাখিলে, বায়ুকে কিয়ৎ পরিমাণে দূষিত করিতে পারে। রাত্রিকালে বৃক্ষ-তলে বাস করিলে অপকার হয় জানিয়া, এতদ্দেশীয় শাস্ত্র-কর্ত্তারা তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গন্ধময় পয়ঃপ্রণালী ও গর্ত্ত প্রভৃতিতে লবণ বা পাথরিয়া চূন নিক্ষেপ করিলে, এক প্রকার রাসায়নিক কার্য্য উপস্থিত হয়, তাহাতে দূষিত পদার্থ সকল রূপান্ত-রিত হইয়া যায়। পীড়িত ব্যক্তির বাসগৃহে, নানা প্রকার দুর্গন্ধময় ও দূষিত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া তত্রস্থ বায়ুকে অনিষ্টকর করে; তখন, লবণ বা পাথরিয়া চূণে জল মিশা-ইয়া, গৃহের সকল স্থানে বিক্ষিপ্ত করিলে, ও গৃহের চতু-ষ্কোণে অঙ্গার, লবণ বা চূণ রাখিয়া দিলে, গৃহের বায়ুতে আর দোষ থাকে না। সম্প্রতি “কার্বোনিক এসিড্” নামক এক প্রকার পদার্থ দ্বারা পয়ঃপ্রণালীর পুতিগন্ধাদি দোষ নিবারণ করা হইয়া থাকে।

প্রত্যহ ৪।৫ ঘন্টাকাল বিশুদ্ধবায়ু সেবন করা কর্ত্তব্য। গ্রীষ্মকালে সূর্য্যোদয়ের কিয়ৎক্ষণ পরেই গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে, প্রচণ্ড রৌদ্র-ভোগে পীড়া হইতে পারে, এজন্য তখন অতি প্রত্যূষে বায়ুসেবনার্থে বাহিরে যাওয়া উচিত। বিকালে রৌদ্রের হ্রাস হইলে, বাহির হইয়া

সন্ধ্যার প্রাক্কালেই প্রত্যাবৃত্ত হওয়া বিধেয়। শীতকালের প্রাতঃকালে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে কিঞ্চিৎ বেলা হইলে অধিক ক্লেশ হয় না। তৎকালে সন্ধ্যার সময় বা সন্ধ্যার পর বাহিরে থাকিলে, শিশির ভোগ করিয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা।

পঞ্চম অধ্যায়।
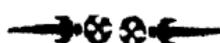
পরিচ্ছন্নতা।

শরীর সর্ব্বদা পরিষ্কৃত না রাখিলে, কোনমতেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না। আমাদের রোমকূপদ্বারা যে সকল দূষিত পদার্থ অনবরত বাহির হইতেছে, তৎসমুদায় কোন রূপে শরীরে থাকিয়া গেলে রোগ জন্মিতে পারে। ত্বকের অসঙ্খ্য ছিদ্র দ্বারা ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হয়, ইহাতে যে সকল পদার্থ নির্গত হয়, তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়; অবশিষ্ট ভাগ কঠিন হইয়া শরীরে লগ্ন হইয়া থাকে। শরীরের মলা দূর করা স্নান ও গাত্রমার্জ্জনার উদ্দেশ্য।

ঘর্ম্মরোধ হইলে যে সকল পীড়া হইতে পারে তদ্বিষয়ে

ডাক্তার এণ্ডুকুম্ব সাহেব নিম্নলিখিত রূপে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

"যে যে যন্ত্রদ্বারা শরীরের অকর্ম্মণ্য বা দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে, ঘর্ম্মরোধ হইলে তাহাদের মধ্যে কোন না কোনটীর উপদ্রব উপস্থিত হয়। ত্বক্‌, মলনির্গম, মূত্রাশয়, ফুস্‌ফুস্‌ ও যকৃৎ দ্বারা শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যায়; ত্বকের কার্য্যরোধ হইলে ইহার মধ্যে অন্যতরটীর দ্বারা অধিক পরিমাণে কার্য্য করাইবার প্রয়োজন হয়, সুতরাং যে যন্ত্রটী অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল থাকে, প্রথমতঃ তাহারই রোগ জন্মে। ঘর্ম্মরোধ হইলে কোন ব্যক্তির অন্ত্র বা মলাশয় রোগাক্রান্ত হইয়া উদরাময় উপস্থিত করে, কাহারও বা ফুসফুস্‌ প্রপীড়িত হইয়া কফ কাশি অথবা অন্য কোন রোগ উৎপন্ন করিয়া দেয়। যে ব্যক্তির শরীরের অভ্যন্তরস্থ সমুদায় যন্ত্র সুস্থ অবস্থায় আছে, তাহার সামান্য অসুখ মাত্র লক্ষিত হয় এবং কিয়ৎক্ষণের মধ্যে শরীর পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠে।

'অপ্রশস্ত গৃহের অভ্যন্তরে লোকসমাগম হইলে অধিক উত্তাপ হয়, তৎকালে ত্বক্‌দ্বারা বাষ্পাকারে অনবরত ঘর্ম্ম বাহির হইয়া যায়, সুতরাং মূত্রাশয়ের কার্য্যরোধ হয়। পরে বাহিরের শীতল বায়ুতে গমন করিলে ঘর্ম্মরোধ হয়, তখন পুনরায় মূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইয়া উঠে। মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে ঘর্ম্মদ্বারা নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হয়, তখন ঘর্ম্মে মূত্রের দুর্গন্ধও লক্ষিত হইয়া থাকে। এই

সকল উদাহরণ দ্বারা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, একটী যন্ত্রের কার্য্যরোধ হইলে অপর কোনটীর কার্য্য বৃদ্ধি হয়।

"যে ব্যক্তির ফুস্‌ফুস্‌ স্বভাবতঃ সবল নহে, অর্থাৎ যাহার কফ কাশি সহজেই হইয়া থাকে, এরূপ লোকের ঘর্ম্মরোধ হইলে মহা ক্লেশ উপস্থিত হয়। ফুস্‌ফুস্‌ হইতে অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইতে থাকে, তাহা দূরীকৃত হইতে না পারিলে, ফুস্‌ফুসের বায়ুকোষ সকল কফপূর্ণ হইয়া নিশ্বাস রোধ করিতে পারে, কিন্তু এই অনিষ্ট নিবারণের একটী সহজ উপায় নির্দ্দিষ্ট আছে। বায়ুকোষে কফ সঞ্চিত হইবামাত্র এরূপ অসুখ বোধ হয়, যে আমরা তৎক্ষণাৎ কাশিতে থাকি, তাহাতে কফ বহির্গত হইয়া যায়। ঘর্ম্মরোধ হইয়া কখন কখন ফুস্‌ফুসের এরূপ রোগ উপস্থিত হয়, যে তাহাতে মৃত্যুও হইয়া থাকে।

"ঘর্ম্মরোধ হইলে কফ হইবার বিশেষ কারণই আছে। শীত প্রভাবে সকল বস্তুই সঙ্কুচিত হয়, সুতরাং আমাদের ত্বকে সহসা শীতল বায়ু অথবা জল লাগিলে লোমকূপ সকল সঙ্কুচিত হয়, অথবা একবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন লোমকূপদ্বারা দূষিত পদার্থ বাহির হইতে না পারিয়া ফুস্‌ফুস্‌ প্রভৃতি পথে যাইয়া পীড়া উপস্থিত করে। কফ হইলে শরীর ও মন যেরূপ অসচ্ছন্দ হয়, অনেকেই তাহা অনুভব করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও দন্তশূল জন্মাইয়া নিদ্রা হরণ করে, কাহারও বা ক্লেশকর জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। কফ জন্মাইতে না দিলে

অনেকের জ্বর হইতে পারে না। পাকযন্ত্রের যে সকল রোগ সচরাচর দৃষ্ট হয়, ইহা তাহাদের অনেকেরই আদি করণ। অতএব যাহাতে কফ না হইতে পারে তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নকরা সকলেরই কর্ত্তব্য। কফ নিবারণের যে যে উপায় আছে তন্মধ্যে স্নান ও গাত্রমার্জ্জনা প্রধান। কফ উপস্থিত হইলে কোন রূপে ঘর্ম্ম উৎপাদন করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। শরীরে সামর্থ্য থাকিলে কিয়ৎকাল শারীরিক পরিশ্রম করিলেই ঘর্ম্মারম্ভ হয়, তৎকালে পুনরায় ঘর্ম্মরোধ না হয় এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিতে পারিলেই কফ অন্তর্হিত হইয়া যায়। উক্তরূপ পরিশ্রম করিবার পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে শীতল বা উষ্ণ জল পান করিলে ঘর্ম্মনিঃসরণের সুবিধা হয়। শরীর বস্ত্রাবৃত করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলেও কখন কখন কফ দূরীভূত হয়। অনেক সময়ে প্রচুর পরিমাণে জলপান করিয়া একদিন অনাহারী থাকিলে সহজে কফ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।”

সুস্থ-শরীরে প্রত্যহ প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করা কর্ত্তব্য। রাত্রিকালীন বিশ্রামান্তে তখন শরীরে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তি থাকে, শীতল জলে স্নান করিলে তাহা আরও বৃদ্ধি পায়। প্রথমতঃ গ্রীষ্মকাল হইতে প্রত্যূষে স্নান অভ্যাস করা উচিত। তাহা হইলে কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই শীতল জল সহ্য হইয়া উঠে। শীতল জল অভ্যাস পাইয়া গেলে, শরীরে সামর্থ্য হয়, ও কফ,

কাশি প্রভৃতি রোগ জন্মিতে পারে না। প্রাতঃস্নানের ফল এত অধিক যে তাহা বর্ণনা করিয়া উঠা যায় না। আমাদের শাস্ত্রকর্ত্তারা ইহার বিধান করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন।

অবগাহন করিয়া স্নান করিলে অতি সহজে শরীরের মলা দূর হয়, ও তাহাতে সর্ব্বশরীরে সুখানুভব হইতে থাকে। যে নদী বা পুষ্করিণীর জল উৎকৃষ্ট তাহাতেই স্নান করা কর্ত্তব্য, নতুবা পীড়া হইবার সম্ভাবনা। যে স্থানে ভাল জল পাওয়া দুষ্কর, তথায় অগত্যা বাটীতে স্নান করিতে হয়। জল মন্দ হইলে তাহা ভাল করিয়া সিদ্ধ করিয়া, পরে শীতল হইলে তাহাতে স্নান করিবে।

আমাদের দেশের অনেকের সংস্কার আছে, অদ্য এক জল কল্য অন্য জলাশয়ের জলে স্নান করিলে সর্দ্দি, জ্বর প্রভৃতি রোগ হয়। কিন্তু এ বিশ্বাসটী নিতান্ত ভ্রান্তি-মূলক। অপরিষ্কৃত বা পচা জলে স্নান করিলে পীড়া হয় বটে, কিন্তু কোন ভাল পুষ্করিণী বা নদীর জল ত্যাগ করিয়া তাদৃশ অন্য জলাশয়ে স্নান করিলে কখনই পীড়া হইবার কথা নহে। বাস্তবিক লোকে বিদেশে যাইবার সময় নানা প্রকার অনিয়ম করিয়া রোগ উৎপাদন করে, শেষে জলের দোষ দিয়া স্বীয় নির্ব্বুদ্ধিতা গোপন করিয়া থাকে।

যাহারা প্রত্যূষে স্নান করিতে পারেন না, ৮৷৯ টা বেলার মধ্যে স্নান করা তাহাদের কর্ত্তব্য। প্রত্যহ এক

সময়ে স্নান করিলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, ও অন্যান্য কাজও সময় মত করা যাইতে পারে। আহারের অন্ততঃ ১ ঘন্টা পূর্ব্বে অথবা ৩ ঘন্টা পরে স্নান করা কর্ত্তব্য।

পীড়াকালে স্নান করিতে হইলে উষ্ণ জল ব্যবহার করা উচিত। এরূপ সময়ে গৃহের অভ্যন্তরে যেখানে বায়ুর গমনাগমন হয় না, এরূপ স্থানে বসিয়া স্নান করিবে। তখন সহসা শীতল বাতাস গায়ে লাগিলে লোমকূপ সঙ্কুচিত হইয়া সর্দ্দি লাগিতে ও জ্বর হইতে পারে। শ্রম করিয়া যৎকালে শরীর উত্তপ্ত হয়, তখন স্নান করিলে ঘর্ম্ম রোধ হইয়া পীড়া জন্মিতে পারে। সুন্দর রূপে বিশ্রাম না করিয়া স্নান করিলে রোগ ও মৃত্যু হইতে পারে।

উষ্ণ জলে স্নান অভ্যাস করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। ইহাতে শরীর দুর্ব্বল হইতে থাকে, অধিক পরিমাণে ঘর্ম্ম নির্গত হয়, ও কোন কারণবশতঃ অল্প শীত বা শিশির ভোগ করিলেই পীড়া জন্মে। শরীরের স্বাভাবিক আবরণই ত্বক্, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উষ্ণ জল ব্যবহার করিলে ইহাতে আর প্রকৃতরূপে শরীরের আবরণের কার্য্য হয় না. তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কৃত্রিম আবরণ দ্বারা শরীর রক্ষা করিতে বাধ্য হইতে হয়।

অবগাহন করিয়া স্নান করিবার কালে শরীর ইতস্ততঃ চালিত করিবার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। তাহাতে ব্যায়ামজনিত সুখানুভব হইতে থাকে, ও কিঞ্চিৎ অধিক কাল জলে থাকিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না। গায়ে অধিক

মলা থাকিলে সাবান, ব্যাসোম, বা খোল দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিতে হয়। অভ্যাস অনুসারে কেহ বা অল্প-ক্ষণ কেহ বা অধিক ক্ষণ জলে থাকিয়া স্নান করেন, কিন্তু ১৫ মিনিটের অধিক কাল জলে থাকিলে অনেকেরই পীড়া হয়।

স্নানের জন্য জলে নামিবার পূর্ব্বে মাতায় একটু জল দিয়া তাহার পরে অবগাহন করিবে। লম্ফ প্রদান করিয়া জলে পড়া নির্ব্বোধের কর্ম্ম। তাহাতে শরীরে আঘাত লাগিতে পারে। জলের মধ্যে কাট, বাঁশ প্রভৃতি কোন জিনিষ থাকিলে ত এককালে প্রাণবিনাশ হইবারই কথা।

স্নানান্তে, শুষ্ক মোটা কাপড় বা তোয়ালে দিয়া, গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীরের স্বাভাবিক তাপ উদ্ভাবিত হয়। অন্যান্য সময়েও গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার ঐ রূপ করা উচিত। রাত্রিকালে শয়ন করিবার পূর্ব্বে, ভাল করিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিলে শরীর পরিষ্কৃত হয়, ও তৎকালে যে অল্প ব্যায়াম হয়, তাহাতে সুনিদ্রার বিলক্ষণ সুবিধা হইয়া উঠে।

স্নানের পর আর্দ্র বস্ত্র ধারণ করিলে পীড়া হয়। তাহার যে ভাগ শরীরে সংলগ্ন থাকে, তাহার জলের কিয়দংশ শরীরের উত্তাপে বাষ্প হইতে থাকে। কোন তরল পদার্থ বাষ্প হইবার সময় নিকটবর্ত্তী পদার্থ হইতে তাপ হরণ করে; শরীরলগ্ন বস্ত্রের জল দ্বারাও এই কার্য্যটী হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতে শরীরের তাপ নষ্ট করে। যে

অঙ্গের তাপ হ্রাস হয়, তত্রত্য রক্ত, স্থানভ্রষ্ট হইয়া অন্য অঙ্গে গমন করিয়া পীড়া জন্মায়। গৃহ হইতে দূরে স্নান করিতে গেলে সঙ্গে শুষ্ক বস্ত্র লইয়া যাওয়া উচিত।

আমাদের দেশে অনেকে শরীরে তৈল মর্দ্দন করিয়া থাকেন, ইহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। তৈল দিলে শরীর মসৃন ও চুল কৃষ্ণ বর্ণ থাকে, কিন্তু শরীরে তৈল লাগিয়া থাকিলে মলা পড়ে, তাহাতে রোমকূপ বদ্ধ হইয়া পীড়া হইবার সম্ভাবনা। মস্তকে তৈল দিয়া স্নান করিলে মস্তিষ্ক শীতল থাকে।

হস্তপদাদি অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল জলে প্রক্ষালন করিয়া গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলিবে। রাত্রি-কালে শয়নের পূর্ব্বে এইরূপ করিলে উপকার হয়। পদদ্বয়ে শীতল জল সহ্য হইলে মোজা ব্যবহার করিবার প্রয়োজন থাকে না।

আমাদের দেশের অনেকেই মলিন বসন পরিধান, ও অপরিষ্কৃত শয্যা ও আসনে শয়নোপবেশনাদি করিয়া থাকেন। এরূপ করাতে শরীরে নানা প্রকার মলা সংযুক্ত হয়, সুতরাং তাহাতে পীড়া হইবার সম্ভাবনা। সর্ব্বদা এক বস্ত্র পরিধান করিতে গেলে তাহা পরিষ্কৃত থাকে না, এজন্য গ্রীষ্মকালে প্রত্যহ ২ বার ও শীতকালে অন্ততঃ একবার বস্ত্র পরিত্যাগ করা উচিত। রোগ হইলে ৩।৪ বার ঐরূপ করা আবশ্যক। প্রত্যহ পরিধানবস্ত্র সুন্দর রূপ ধৌত করিবে, ও সপ্তাহে অন্ততঃ দুই বার রজক-গৃহে

পাঠাইবে। অনেকে ঘর্ম্মসিক্ত দুর্গন্ধময় কাপড় প্রতি নিয়ত ১০।১২ দিন ব্যবহার করিয়া থাকেন, এরূপ করা নির্ব্বোধের কর্ম্ম।

আমাদের শয্যা প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া ও সপ্তাহে অন্ততঃ একবার শয্যাবস্ত্র পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, নতুবা তাহা অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে।

সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিলে, মন প্রফুল্ল থাকে, অপরিষ্কৃত থাকিলে নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রসন্নচিত্তে সকল কার্য্যই করা যায়; বিষণ্ণভাবে অতি প্রীতিকর বিষয়েও বিরক্তি জন্মে।

যাহারা সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত থাকে, তাহাদের পাচড়া প্রভৃতি নানা প্রকার অসহ্য ও ঘৃণিত রোগ হইয়া থাকে। তাহাদের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।

অন্য লোকের বস্ত্র পরিধান, গামছা ব্যবহার ও শয্যায় শয়ন করা অন্যায়, তাহাতে নানা প্রকার সংক্রামক রোগ জন্মিতে পারে।

* আমাদের দেশে সংক্রামক রোগের মধ্যে হাম, বসন্ত, জ্বরবিকার ও ওলাউঠা সচরাচর প্রাদুর্ভূত হয়। হাম ও বসন্ত রোগে শরীর হইতে যে দূষিত পদার্থ নির্গত হয় তাহা শয্যা, বস্ত্র, ও গৃহসামগ্রীতে দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্বরবিকার ও ওলাউঠার দূষিত পদার্থ,

---

* Social Science and Sanitary Review, June 1866.

বস্ত্র অথবা পানীয় জল সহকারে অন্যত্র চালিত হইয়া অনিষ্টকারী হয়।

এই সকল সংক্রামক রোগ যাহাতে দেশ-ব্যাপ্ত না হয় তদ্বিষয়ে অনেক প্রকার উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রোগীর গৃহে অতি সুন্দররূপে বায়ু সঞ্চালনের উপায় রাখা উচিত। তাহা হইলে অনিষ্ট-কারী পদার্থ সকল ইতস্ততঃ চালিত হইয়া এত সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হইয়া যায়, যে আর তাহাতে কোন প্রকার ক্ষতি হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ শয্যা, বস্ত্র, ও গৃহ-সামগ্রী অত্যুষ্ণজলদ্বারা পরিষ্কার করিলে ও গৃহের স্থানে স্থানে অগ্নি জ্বালিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে, কারণ ইহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে যে তাপমান যন্ত্রের ২১২ ডিগ্রী পরিমাণে উত্তাপ লাগিলে সর্ব্বপ্রকার বিষাক্ত পদার্থই নিস্তেজ হইয়া যায়। তৃতীয়তঃ জলদ্বারা গৃহ ও বস্ত্রাদি ভাল করিয়া ধৌত করিলেও অনেক দোষ নিবারণ হইতে পারে।

দূষিত পদার্থ শরীর স্পর্শ করিলে অথবা রক্তের সহিত যুক্ত হইলে সচরাচর সংক্রামক রোগ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু রোগীর নিকট গমন করিলে অনেক সময়ে ইহা বায়ুদ্বারা চালিত হইয়া আমাদের গাত্র স্পর্শ করিতে পারে, কখন বা রোগীর মলমূত্র হইতে ব্যাপ্ত হয়, কখন রোগীর বস্ত্র বা গৃহ সামগ্রীর সঙ্গে অন্যের শরীরে যায়, ও মধ্যে মধ্যে যে সকল সুস্থকায় ব্যক্তি রোগীকে

দেখিতে যায় তাহাদের শরীর ও বস্ত্রে যুক্ত হইয়া আসিয়া, অপরাপর ব্যক্তির শরীরে লাগিয়া পীড়াদায়ক হইয়া উঠে।

কোন কোন সংক্রামক রোগ জন্মের মধ্যে প্রায় এক-বারের অধিক হয় না। হাম ও বসন্ত রোগ এই শ্রেণী-ভুক্ত। এজন্য অনেকে বাল্যকালে কৃত্রিম বসন্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি একাধিক বার বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। গোবীজের টীকা দিলে এই রোগ আক্রমণ করিতে পারে না ও যাহা-দিগকে আক্রমণ করে তাহাদের শরীরে অধিক প্রাদুর্ভাব দেখাইতে পারে না।

বসন্ত-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে দেখিতে গেলে বিশেষ সতক হওয়া আবশ্যক। যাহাদের কখন বসন্ত হয় নাই, তাহারা এরূপ রোগীর নিকট গমন করিলে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা। এরূপ রোগীর নিকট হইতে আগমন করিবা মাত্র স্নান ও বস্ত্রত্যাগ করিবে, অতি দীর্ঘ কাল নির্ম্মল বাহিরের বায়ুতে বেড়াইবে, নতুবা অল্প বয়স্ক-বালকদিগের নিকট গমন করিলে তাহাদের পীড়া হইবার সম্ভাবনা। রোগীর গৃহে অপ্রয়োজনীয় শয্যা ও বস্ত্রাদি রাখিবে না এবং রোগীর মলমূত্রাদি চূণপরিপূর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করিবে। রোগীর বস্ত্র ও শয্যাদি প্রথমতঃ অত্যুষ্ণ জলে পরিষ্কৃত না করিয়া রজক গৃহে অথবা অন্য কোন স্থানে পাঠাইবে না, কারণ তাহাতে অন্য লোকের

রোগ জন্মিতে পারে। রোগ শেষ হইলে সমস্ত দ্রব্যাদি পরিষ্কার করিবে, এবং গৃহে চূর্ণ ফিরাইয়া দিবে।

এবিষয়ে আমাদের দেশে কয়েকটী সুন্দর প্রথা প্রচলিত আছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সহকারে তাহা লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। বাটীর মধ্যে কাহারও বসন্ত রোগ অথবা টীকা দেওয়া হইলে বস্ত্রাদি রজকগৃহে পাঠান হয় না, এবং শবদাহ করিয়া গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শরীরে অগ্নিসংযোগ করিতে হয়। গৃহ ও বস্ত্র অনবরত ধৌত করাও আমাদের দেশের চির-প্রচলিত রীতি। সংক্রামক রোগের ব্যাপ্তি নিবারণ জন্য এই সকল প্রাচীন প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

পরিধেয়।

শরীরে নিতান্ত শীতল বা উষ্ণ বায়ু লাগিলে ক্লেশ হইয়া থাকে, তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত আমরা বস্ত্র দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া রাখি। কার্পাস, রেশম, পশম প্রভৃতির সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, আমরা সচরাচর তাহাই ব্যবহার করিয়া থাকি। কার্পাস অপেক্ষা রেশম ও পশ-

মের অধিক অপরিচালকতা গুণ আছে; ইহাতে শরীর আচ্ছাদিত থাকিলে, বাহিরের তাপ শরীরে প্রবেশ করিতে ও শরীরের স্বাভাবিক তাপ বহির্গত হইতে পারে না, এজন্য শীতকালে রেশম ও পশমের অধিক পরিমাণে ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

যখন অতিশয় শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়, তৎকালে শরীর সুন্দররূপে আবৃত না রাখিলে, শারীরিক তাপ ক্রমে ক্রমে বাহির হইয়া পড়ে; তাহাতে প্রথমতঃ রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া স্থগিত হয়, ও পরিশেষে মৃত্যু হইতে পারে। এদেশে শীত অতি অল্প; কিন্তু রুসিয়া প্রভৃতি দেশে শীতের এত প্রাদুর্ভাব, যে তত্রত্য অসঙ্খ্য লোক আবশ্যকমত শীতবস্ত্র অভাবে সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এদেশে শীতকালে অনাবৃত শরীরে থাকিলে, সহসা মৃত্যু হয় না বটে; কিন্তু তাহাতে নানা-বিধ দুশ্চিকিৎসা রোগপরম্পরা উপস্থিত হইয়া থাকে।

আমাদের দেশে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত বস্ত্র ব্যবহার করিলেই শীত নিবারণ হইতে পারে। যাহারা নিতান্ত দুর্ব্বল, কার্পাসের উপরি রেশম বা পশমের কাপড় ব্যব-হার করা তাহাদের পক্ষে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। নিয়ত পশমী কাপড় ব্যবহার করিলে, নানা দোষ ঘটে। যাঁহারা ইংরাজ জাতির অনুকরণে একাগ্রচিত্ত, তন্মধ্যে অনেকেই ফ্লানেল আদি পশমী কাপড় সততই শরীরে ধারণ করেন; এই সকল কাপড় যে ইংলণ্ড প্রভৃতি

দেশের প্রচণ্ড শীত নিবারণজন্য, ইহা একবারও মনে করেন না। এক্ষণে ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন, সেখানেও ইহা তাদৃশ প্রয়োজনীয় নহে। অন্যান্য বস্ত্রের নীচে ফ্লানেল ধারণ করিলে, ত্বকের শীতসহ্য করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাহার অনেক হ্রাস হইয়া পড়ে; ক্রমে এরূপ হইয়া উঠে যে ক্ষণেক কাল ফ্লানেল পরিত্যাগ করিলেই কফ, কাশি প্রভৃতি পীড়ার উদ্রেক হয়।

আমরা যে প্রণালীতে ফ্লানেল ব্যবহার করি, তাহাতে আরও একটী দোষ জন্মে। ইহা শরীর-সংলগ্ন থাকিলে, ঘর্ম্মশোষণ করিয়া অল্প ক্ষণের মধ্যেই অপরিষ্কৃত হইয়া উঠে; যখন অন্যতর বস্ত্র পরিধান করা উচিত। কিন্তু আমরা তাহা না করিয়া অপরিচ্ছন্নতা জনিত রোগ পরম্পরা দ্বারা আক্রান্ত হই।

পরিধেয় ধুতী ও পিরাণ ঘর্ম্মযুক্ত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা ধৌত করা আবশ্যক। শ্বেতবর্ণের কাপড় শীঘ্র শীঘ্র মলিন হয় বলিয়া অনেকে রঙ্গিন কাপড়ের পিরান ও চাপকান ব্যবহার করেন। এই সকল কাপড়ের মলা দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হউক আর না হউক, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনায়াসে অনুভূত হয়। দুর্গন্ধ হইলে তাহা পরিষ্কার করা আবশ্যক।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশে ষ্টকিং ব্যবহার ছিল না, বরং পদদ্বয় অপরিষ্কৃত হইলে তৎক্ষণাৎ শীতল

জলে ধৌত করা রীতি ছিল। কিন্তু এক্ষণে অনেকেই ষ্টকিং পরিধান করিতেছেন, এবং কেহ কেহ নিদ্রা কালেও ইহা পরিত্যাগ করেন না। এরূপ করাতে পদদ্বয় এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া যায়, যে কোন প্রকারে শীতল বায়ু বা জলসংযুক্ত হইলেই শরীরে রোগ উপস্থিত করে। এদেশে যাহারা মধ্যে মধ্যে শীতল জলে পদ প্রক্ষালন ও শুষ্ক বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করেন, এবং প্রত্যূষে শীতল জলে স্নান করেন, তাঁহাদিগকে ষ্টকিং ও ফ্লানেল ক্রয় করিতে প্রায়ই বাধ্য হইতে হয় না।

ডাক্তার ফাউলার লিখিয়াছেন, "পদদ্বয় ও মস্তক শীতল রাখা আবশ্যক। পদদ্বয় শীতল হইলে মস্তিষ্কে অধিক রক্ত যাইয়া শিরঃপীড়া উৎপাদন করে। বারম্বার প্রক্ষালন ও মার্জ্জনা করিলেই পদদ্বয় উষ্ণ থাকে। ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল থাকে। আমরা জুতা ও ষ্টকিং পরিধান করিলে অথবা অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত করিলে পদদ্বয় উষ্ণ থাকিবে এরূপ নহে। ব্যায়াম ও প্রক্ষালন দ্বারা পদদ্বয়ে সুন্দররূপে রক্ত সঞ্চালনের উপায় করিয়া দিলেই উদ্দেশ্য সফল হইবে, জুতা ও ষ্টকিং দ্বারা তাহা কোনমতেই হইবে না। বরং ইহাদের দ্বারা রক্ত সঞ্চালনের বাধা হয়, তাহাতে পদদ্বয় শীতলই হইয়া যায়। এস্থলে আমার বিশেষ অনুরোধ যে, বালকদিগকে ষ্টকিং পরিধান করিতে দিবে না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, যে ষ্টকিং ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত

উষ্ণ হইতে পারে। যাহারা দীর্ঘকাল ষ্টকিং ব্যবহার করিয়া পদদ্বয় অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারা গ্রীষ্ম-কাল হইতে ইহা পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা পাইলে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিতে পারে। বালকেরা জুতা ও ষ্টকিং ব্যবহার করিতে চাহে না। শূন্যপদে বেড়াইতে দিলে, তাহাদের পদদ্বয়ের নিম্নভাগ কঠিন ত্বক্-দ্বারা আবৃত হয়, ও পদদ্বয়ে নির্ব্বিঘ্নে রক্তসঞ্চালন হইতে পারে এরূপে তাহারা আবশ্যকমত উষ্ণ থাকে।

আমাদের দেশের অনেকে ইংরাজ জাতির অনুকরণ-প্রিয় হইয়া টুপী ও কম্ফর্টার ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেছেন। ডাক্তার ফাউলার লিখিয়াছেন "টুপী ধারণ করিলে মস্তকের ঘর্ম্মরোধ হয়, এবং মস্তক উত্তপ্ত ও ভারাক্রান্ত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির জড়তা জন্মায়। গলদেশ আবৃত থাকিলে ঘর্ম্ম এবং মলা সেই আবরণবস্ত্রে লাগিয়া থাকে। ইহাতে ফুস্ফুসের রোগও জন্মে। প্রকৃতির অনুসরণ করিতে হইলে শ্মশ্রু ধারণ করা উচিত, তদ্দ্বারা গলদেশ ও বক্ষঃস্থল রক্ষা হইতে পারে। অবলাগণ গলদেশ আবৃত রাখে না, সবল পুরুষেরা কি স্ত্রীজাতি অপেক্ষাও দুর্ব্বল ?"

এক্ষণে এতদ্দেশের পুরুষেরা যে সকল বস্ত্র ব্যবহার করেন, তাহাতে শীতজনিত কষ্ট পান না, কিন্তু দুর্ভাগা স্ত্রীলোকেরা শীতবস্ত্রাভাবে অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে শাটী পরিধান করেন, তাহাই

তাঁহাদের একমাত্র বস্ত্র; শিল্পনৈপুণ্য প্রভাবে তাহাও আবার এত সূক্ষ্মসূত্র-বিনির্ম্মিত হইতেছে, যে তদ্দ্বারা না দেহাবরণ, না শীত নিবারণ হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভদ্রজাতির স্ত্রীলোকেরা যে প্রণালীতে বস্ত্র পরিধান করেন, তাহা অপেক্ষাকৃত অনেক উত্তম। এতদ্দেশে তদ্রূপ কোন উপায় অবলম্বন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

রৌদ্রে বেড়াইতে হইলে, শুভ্রবস্ত্রাবৃত ছত্র দ্বারা মস্তকাদি আবৃত রাখা, এবং তৎকালে শুভ্র বস্ত্র পরিধান করা আবশ্যক। শুভ্র পদার্থে সূর্য্যের তাপ লাগিবা মাত্র তাহা তৎক্ষণাৎ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া যায়। কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে তাপশোষণ করিয়া শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠে।

ছাতা ব্যবহার করা নিতান্ত আবশ্যক। শরীরে রৌদ্র লাগাইলে উৎকট পীড়া হয়। বৃষ্টিতে ভিজিয়া বেড়াইলেও জ্বর প্রভৃতি কঠিন রোগ উপস্থিত হয়। এজন্য ছাতা না লইয়া কখন বাহিরে যাওয়া উচিত নহে। এক্ষণে নব্যদলের কেহ কেহ ছাতা না লইয়া রৌদ্রের সময় পদব্রজে গমন করেন। স্বহস্তে ছাতা ধরণ ক্লেশকর অথবা অপমানকর বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাতে অপমান কিছুই দেখা যায় না। তাঁহারা যে ইংরাজদের অনুকরণে বেশভূষা করিয়া থাকেন, সেই ইংরাজেরা ছাতা না লইয়া প্রায়ই বাহিরে যান।

কাদা ও জলে পদদ্বয় ভিজাইয়া বেড়াইলে নানা

রোগ হয়। শক্ত জুতা ব্যবহার করিলে রাস্তার অল্প কাদায় তাহা ভিজিতে পারে না। ভিজা জুতা পরিধান করা নিতান্ত অন্যায়, তাহাতে পদদ্বয় শীতল হইয়া রোগ উৎপাদন করে। কখন জলে ও কাদায় চলিলে তৎপরে ভাল স্থানে উপস্থিত হইবা মাত্র, পদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া শুষ্ক জুতা পরিধান করা উচিত। এরূপ করিয়া কিয়ৎক্ষণ হাঁটিয়া বেড়াইলে পদদ্বয় পুনরায় উষ্ণ হয়। যদি হাঁটিবার সুবিধা না হয়, তাহা হইলে এরূপে উপবেশন করিবে যাহাতে পদদ্বয়ে শরীরের তাপ লাগিয়া শীঘ্র উষ্ণ হইতে পারে। তৎকালে পদদ্বয়ে অগ্নিসেক করাও মন্দ নহে।

বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজিয়া ও কাদাজলে বেড়াইয়া আমাদের দেশের অনেকে জ্বররোগাক্রান্ত হন। রাত্রিতে অনাবৃত শরীরে শীতল বাতাসে শয়ন করিয়াও অনেকের রোগ হয়। যাহারা এই সকল বিষয়ে সাবধান, বর্ষাকালে তাহারা বিলক্ষণ সুস্থ থাকে। অতএব এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে গাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিবে। এ দেশে গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে কাপড় লাগে না, কিন্তু শীতকালে নানাবিধ বস্ত্র ব্যবহৃত হয়। শীতকাল উপস্থিত হইবার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই শীতবস্ত্র ব্যবহার করিবে, ও শীত অবসানে সহসা শীতবস্ত্র পরিত্যাগ করিবে না। শীতকালের শেষে কোন দিন অল্প কোন দিন

বা অধিক শীত হয়। অল্প কাপড় গায়ে থাকিলে অধিক শীতের দিন কষ্ট হয়, তাহাতে কফ, কাশী প্রভৃতি রোগ জন্মে। এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

সপ্তম অধ্যায়।

বাসগৃহ।

আমাদের দেশে তিন রকমের ঘর প্রচলিত; ইষ্টকালয়, কাঁচা বা পাকা দেয়ালের ঘর, ও বেড়া দেওয়া ঘর। যাহার যেমন অবস্থা তাহাকে সেইরূপ ঘরে থাকিতে হয়, কিন্তু কয়েকটী নিয়ম ধরিয়া চলিলে সকল প্রকার ঘরেই শরীর সুস্থ থাকিতে পারে।

শুষ্ক ও উন্নত স্থানে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে, ও গৃহের চতুর্দ্দিগ হইতে যাহাতে জল গড়াইয়া যাইতে পারে এরূপ উপায় করিয়া রাখিবে। ভূমি আর্দ্র হইলে অনুক্ষণ গমনাগমন কালে পদদ্বয় ভিজিয়া যায়, সুতরাং পীড়া জন্মে। দুর্গন্ধময় স্থানে অথবা কদর্য্য জলাশয়ের নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে না, এরূপ স্থানের বায়ু পীড়াদায়ক। বাটীর নিকটে বড়বড় গাছ থাকিলে রৌদ্র ও বায়ু সুন্দর রূপে সঞ্চরণ করিতে পারে না। বৃহৎ অট্টালিকা থাকিলেও ঐ দোষ ঘটে। রৌদ্র ও বায়ুর গমনাগমন রুদ্ধ হইলে সহজেই পীড়া হয়। তবে বাটীর নিকট দুই চারিটী গাছ থাকিলে

ক্ষতি নাই। বাটী হইতে কিছু দূরে উত্তর সীমায় বৃক্ষাদি থাকিলে শীতকালের তীক্ষ্ণ ও কষ্টদায়ক শীতল বায়ু প্রবল বেগে চলিতে পারে না সুতরাং তাহাতে সুবিধা আছে। বাটীর দক্ষিণদিগ খোলা রাখা কর্ত্তব্য। দক্ষিণ সমীরণ যেরূপ আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ পূর্ব্বদিগের বায়ু আবার তেমনি অনিষ্টকর।

দক্ষিণদ্বারী ঘর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহাতে উত্তর ও পূর্ব্বদিগের ক্লেশদায়ক বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু দক্ষিণের মনোহর বায়ু অব্যাহত রূপে প্রবাহিত হয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দ্বারী ঘরও নিতান্ত মন্দ নহে। উত্তর দ্বারী ঘর নিকৃষ্ট, ইহাতে বাস করিলে শীতকালে অনুক্ষণ কাঁপিতে হয়, ও গ্রীষ্মকালে বাতাস পাওয়া যায় না। প্রথিত আছে হিন্দু রাজারা উত্তর দ্বারী ঘর অপকৃষ্ট বলিয়া তাহার কর গ্রহণ করিতেন না।

ঘরের মেজে নিকটবর্ত্তী ভূমি হইতে অন্ততঃ ২ হাত উচ্চ হওয়া আবশ্যক। নিম্ন হইলে ঘর আর্দ্র হয়। উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব পশ্চিম দিগে ঋজু জানালা থাকা আবশ্যক। জানালা খুলিলে রৌদ্র ও বায়ু দ্বারা গৃহের অভ্যন্তর অনায়াসে শুষ্ক থাকে। কোন রকমে জানালা বদ্ধ থাকিলে নানা প্রকার দোষ ঘটে। কোন কারণে ভাল জানালা রাখিতে না পারিলে দেয়াল বা বেড়ার গায়ে ঠিক ঋজু দুই চারিটী আদ হাত পরিমিত ছিদ্র রাখা কর্ত্তব্য।

ঘরের মেজে বিলক্ষণ শুষ্ক না থাকিলে তাহাতে বিছানা করিয়া শয়ন করা অনুচিত। আর্দ্র স্থানে শুইলে নানাবিধ রোগ জন্মে। যে ঘর আর্দ্র তাহাতে খাট তক্তাপোষ অথবা অন্য কোন দ্রব্য স্থাপন করিয়া তাহার উপর শয্যা প্রস্তুত করিবে। শয়নগৃহে প্রস্তুতকরা খাদ্য দ্রব্য ও অনাবশ্যক গৃহসামগ্রী রাখিবে না। গৃহের নিকটে দুর্গন্ধময় গর্ত্ত ও আবর্জ্জনারাশি থাকিলে বায়ু দূষিত হইয়া নানাবিধ রোগ উৎপাদন করিতে পারে।

বাসগৃহে অধিক লোক একত্র থাকিলে তাহার বায়ু দূষিত হইয়া যায়। সেই বায়ুতে থাকিলে পীড়া জন্মে। কখন এক গৃহে অধিক লোক বাস করিতে হইলে জানালা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দর রূপে বায়ু সঞ্চরণের উপায় করিয়া দেওয়া উচিত। নতুবা বাহিরে শয়ন করাও শ্রেয়ঃ।

এদেশে এমন কুৎসিত প্রণালীতে সূতিকাগৃহ নির্ম্মিত হয়, যে তাহাতে বায়ু গমনাগমনের পথ থাকে না। তথাকার মৃত্তিকাও নিতান্ত আর্দ্র থাকে। এরূপ গৃহ, সকল সময়েই অস্বাস্থ্যকর, বিশেষতঃ বর্ষাকালে নিতান্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। সুস্থকায়, সবল ব্যক্তিরা এরূপ গৃহে বাস করিলে অল্পকালের মধ্যেই পীড়িত হইয়া পড়েন; কিন্তু এদেশের প্রসূতি ও সদ্যোজাত সন্তানেরা এরূপ দুর্ভাগ্য, যে তাহাদিগকে তথায় বাস করিয়া নানা প্রকার ক্লেশকর রোগ ও অকাল মৃত্যুর হস্তে পতিত হইতে হয়। আমরা, প্রাচীন কুপ্রথার অনুগামী হইয়া এই বিষয়ে কত

গুরুতর অপরাধ করিতেছি, তাহা বর্ণনা করা যায় না। দেশস্থ ভদ্রলোকেরা মনোযোগ না করিলে, ইহার প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা নাই *।

অষ্টম অধ্যায়।

ব্যায়াম।

জগদীশ্বর আমাদের শরীর পরিশ্রমোপযোগী করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শরীরের যে অঙ্গ উপযুক্ত রূপে সঞ্চালিত হয়, তাহা বর্দ্ধিত, পুষ্ট ও শ্রমক্ষম হইয়া উঠে; আবার সঞ্চালিত না হইলে তাহারা দুর্ব্বল, শীর্ণ ও শিথিল হইয়া যায়।

আমাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মধ্যে অধিকাংশই পরিশ্রমলব্ধ। যে অন্নদ্বারা আমাদের জীবন রক্ষা হয় তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আহরণ করিতে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন প্রভৃতি নানাবিধ শ্রমসাধ্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হয়। যে গৃহে বাস করিয়া আমরা সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাহা নির্ম্মাণ করিতে কতই শ্রমের প্রয়োজন। বস্ত্র গৃহসামগ্রী প্রভৃতি কোন দ্রব্যই বিনাশ্রমে

---

* বাবু শিবচন্দ্র দেব প্রণীত "শিশুপালন" গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রসূতি ও শিশুসন্তানদিগের স্বাস্থ্য-রক্ষার বিশেষ নিয়মাদি অবগত হইতে পারিবেন।

প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার আরম্ভ হইয়া জন সমাজের অশেষ উন্নতির সোপান হইয়াছে, তাহা প্রস্তুত করিতে কত যত্ন, পরিশ্রম ও শিল্প নৈপুণ্যের প্রয়োজন।

পরিশ্রম অশেষ সুখের আকর। যাহারা শ্রমবিমুখ তাহারা কত প্রকার শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ অনুভব করে তাহা বর্ণনা করা যায় না। শ্রম না করিলে আহার নিদ্রায় প্রবৃত্তি হয় না, এবং বুদ্ধিশক্তি নিস্তেজ হইয়া যায়। ফলতঃ যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে অনুক্ষণ রত, তাঁহারা কিয়ৎকাল কোন কার্য্য বশতঃ গৃহে অবরুদ্ধ থাকিলে অথবা কার্য্য করিতে না পাইলে নিতান্ত অসুখী হইয়া থাকেন।

আমাদের দেশে অনেক ভদ্র সন্তান শারীরিক পরিশ্রম করিতে অপমান বোধ করেন, এরূপ করা কখনই প্রকৃত মনুষ্যত্বের কার্য্য নহে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ এরূপ অভিমানী যে স্বীয় প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া স্বহস্তে আনিতে ও অপমান বোধ করে। শ্রমসাধ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে ইহারা একান্ত পরাঙ্মুখ, এজন্য ইহাদের অন্নাচ্ছাদন জুটিয়া উঠা ভার হইয়াছে। কৃত্রিম বংশ মর্য্যাদার অনুরোধ ইহারা ক্রমশঃ হীনাবস্থায় পতিত হইতেছে। অনেকে অন্যের গলগ্রহ হয়, কেহ কেহ ভিক্ষোপজীবী হইয়া উঠে, তথাপি স্বীয় পরিশ্রমদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে চাহে না।

যে সকল মহানুভব ব্যক্তি মানবজাতির অশেষ উপকার করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহারা পরিশ্রম করিতে কাতর হইতেন না। রুশিয়ার সম্রাট্ পীটার, স্বহস্তে অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়া স্বীয় রাজ্যে গমন করিয়া প্রজাদিগকে তদ্বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। ফ্রান্সদেশীয় রাজকুমার নেপোলিয়ন্ মুদ্রাঙ্কনকার্য্য শিক্ষা করিয়াছেন। মহাত্মা জর্জ ওয়াসিংটনের উদ্যোগে আমেরিকা স্বাধীন হয় এবং তিনি তদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের সভাপতির পদে পুনঃ পুনঃ মনোনীত হন। আমেরিকার প্রজাতন্ত্র প্রণালীর সভাপতির পদ ইউরোপের কোন সম্রাটের পদ অপেক্ষা ন্যূন নহে, কিন্তু এরূপ উচ্চ পদে থাকিয়াও অবকাশকালে জর্জওয়াসিংটন্ স্বহস্তে হলচালন করিতেন। প্রসিদ্ধ এব্রাহাম লিঙ্কন প্রথমতঃ নৌকাবহন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন, পরে স্বীয় পরিশ্রম ও বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া আমেরিকার সভাপতি হন। আমেরিকার বিগত যুদ্ধকালে ইনি যেরূপ অসামান্য ধীশক্তি ও মহত্ত্ব সহকারে রাজ্যভার বহন করিয়া দাসদিগকে স্বাধীনতা দান করেন, তাহা অনেকেরই স্মরণ থাকিতে পারে। এই মহাত্মার অকাল মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁহার সহকারী জন্‌সন্ রাজ্যভার গ্রহণ করেন, ইনিও কোন অংশে লিঙ্কনের পদের অযোগ্য নহেন। এই ব্যক্তি ২০ বৎসর বয়ক্রমকাল পর্য্যন্ত লেখা পড়া শিক্ষা করিতে সুযোগ পান নাই, পরে পরিণয়সূত্রে বদ্ধ হইয়া

স্ত্রীর নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। ইনি দরজির ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বেঞ্জামিন্ ফ্রাঙ্কলিন প্রথমতঃ মুদ্রাযন্ত্রে অক্ষরযোজনা করিতেন, পরে আমেরিকা স্বাধীন হইলে একজন প্রধান রাজপুরুষ হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা বিজ্ঞানশাস্ত্রের কত উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। কবিকুল চূড়ামণি উইলিয়ম সেক্সপিয়ার স্বহস্তে ইষ্টকাদি বহন করিয়া নাট্যশালা নির্ম্মাণ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। অতএব পরিশ্রম যে নীচলোকের বৃত্তি ইহা কখনই স্বীকার করা যায় না। জর্জ ওয়াসিংটন, পীটার প্রভৃতি ব্যক্তি যে সকল কার্য্যে অপমান বোধ করেন নাই, তাহা করিতে আমরা কেন কুণ্ঠিত হইব? এক্ষণে আমাদের দেশে যে সকল মহানুভব ইংরাজ উপস্থিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বীয় প্রয়োজনমতে শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিতে পরাঙ্মুখ নন। ইহাঁদের অনুকরণ করিলে কি আমাদের মানের হানি হইবে? সামান্য ইংরাজের দোষের অনুসরণ করিতে আমরা অগ্রসর হই, মহানুভবদিগের গুণের অনুসরণ করিতে এতদ্দেশীয় হতভাগ্যদিগের কষ্ট বোধ হয়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যে অঙ্গ যত পরিচালিত হয়, তাহা তত শীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পড়ে। সেই ক্ষতি পূরণ জন্য, তদভিমুখে শীঘ্র শীঘ্র রক্ত-সঞ্চার হয়, তাহাতে সেই অঙ্গ পুষ্ট হইতে থাকে। যে রক্ত দ্বারা

শরীরের ক্ষতি নিবারণ হয়, তাহা ভুক্ত অন্ন হইতে উৎপন্ন। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে, যে পরিমাণে আহার করিলে সুস্থ থাকা যায়, তৎপরিমিত পরিশ্রম করাই উচিত। তাহার অধিক পরিশ্রম করিলে, ভুক্তঅন্ন দ্বারা আর সম্পূর্ণরূপে শরীরের ক্ষয়নিবারণ হয় না; সুতরাং অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ শরীর দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

অঙ্গবিশেষ যে পরিশ্রমদ্বারা সবল ও বর্দ্ধিত হয়, সচরাচর ইহার অনেক উদাহরণ দেখা যায়। যানবহন করিয়া বেহারাদিগের স্কন্ধদেশ স্থূল ও মাংসল হইয়া উঠে, ও নৌকাচালনদ্বারা মাঝীদিগের হস্তাদির পেশী সকল সংবর্দ্ধিত হয়, ইহা অনেকেই দেখিয়াছেন। পদাতিক ডাক্ হরকরা বা পত্র বাহকেরা সর্ব্বদা পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকে, এজন্য তাহাদের পদদেশের পেশী সকল বিলক্ষণ শক্ত ও স্থূল দেখা যায়। আবার যাহারা কোন প্রকার পরিশ্রম করে না তাহাদের শরীর নিতান্ত কোমল ও শিথিল হইয়া যায়; তাহাদের অস্থিসমূহ এত কোমল যে সামান্য ছুরিকা দ্বারা অনায়াসে দ্বিখণ্ডিত হইতে পারে।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, কোন অঙ্গ চালনা করিবার ইচ্ছা হইলে, সেই ইচ্ছা মস্তিষ্ক দ্বারা উক্ত অঙ্গের স্নায়ুতে বিজ্ঞাপিত হয়; তৎক্ষণাৎ আবার সেই স্নায়ুর বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত অঙ্গের পেশী সঙ্কুচিত হয়, তাহাতেই

অঙ্গসঞ্চালনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অতএব, অঙ্গ-চালনা বিষয়ে ইচ্ছাই একমাত্র কারণ। এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যেরূপ পরিশ্রম করিলে মনের ক্লেশ হয় না, তাহা অতি সহজে করা যাইতে পারে। অনিচ্ছার সহিত কর্ম্ম করিতে গেলে, মনের স্ফূর্ত্তি থাকে না, সুতরাং স্নায়ু সকল আবশ্যকমত কার্য্য করে না, তাহাতে অল্পক্ষণের মধ্যে অঙ্গসকল ক্লান্ত হইয়া পড়ে। এজন্য প্রফুল্ল মনে পরিশ্রম করা উচিত। আন্তরিক যত্ন থাকিলে, লোকে কত পরিশ্রম করিতে পারে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। শুনা গিয়াছে, প্রসিদ্ধ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট, উৎসাহের বশবর্ত্তী হইয়া, ৬ ঘন্টায় ১২০ মাইল পথ অশ্বারোহণে গমন করিয়াছিলেন। সচরাচর এরূপ শুনিতে পাওয়া যায় অর্থ লোভে কোন কোন দস্যুদল ১০।১২ ঘন্টা মধ্যে পদব্রজে ৩০ ক্রোশ পথ ভ্রমণ ও সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধন করিয়াছে।

অভ্যাস পরিশ্রমের প্রধান সাধন। কোন কোন ব্যক্তি অল্প পরিশ্রম করিয়াই শ্রান্ত হইয়া পড়ে; কেহ বা তদপেক্ষা ১০।১৫ বা ২০ গুণ শ্রম করিয়াও ক্লিষ্ট হয় না। ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে অধিক পরিশ্রম সহ্য হইয়া উঠে। বলবান্ ব্যক্তিরা, দুর্ব্বল ব্যক্তিদিগের অপেক্ষায় অধিক পরিশ্রম করিতে পারে; দুর্ব্বল ব্যক্তিরাও পরিশ্রম করিতে করিতে ক্রমে সবল হইয়া

উঠে। কোন কোন রোগ, শুদ্ধ নিয়মিত পরিশ্রম দ্বারা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যেমন নিয়ত পরিচালিত হইলে অঙ্গবিশেষের বল বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ সমুদায় শরীরের সঞ্চালন হইলে, সমস্ত শরীরের বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে। যেমন শারীরিক পরিশ্রম করিলে শরীর শক্ত হয়, সেইরূপ মানসিক পরিশ্রম করিলে মনোবৃত্তি সতেজ হইয়া উঠে। শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার পরিশ্রমই এক নিয়মের অধীন। অতিরিক্ত হইলে, দুয়েতেই অনিষ্ট ঘটিতে পারে।

পৃথিবীর অনেক লোকে ব্যবসায়ের অনুরোধে পরিশ্রম করিয়া সংসার নির্ব্বাহ করে, কিন্তু সকল ব্যবসায়ে সর্ব্ব শরীরের সঞ্চালন হয় না। বিশেষতঃ যাহারা মানসিক শ্রমে রত, তাহাদের শারীরিক পরিশ্রম করিবার বড় প্রয়োজন হয় না। এই সকল ব্যক্তিরা স্বতন্ত্র রূপে শারীরিক পরিশ্রম না করিলে রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। ইহারা শরীররক্ষার্থ যে পরিশ্রম করে তাহাকে ব্যায়াম কহে। ব্যায়াম নানাবিধ। এস্থলে তন্মধ্যে কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ব্যায়ামের মধ্যে পদব্রজে ভ্রমণ অল্পায়াস সাধ্য। প্রত্যহ প্রত্যূষে দেড় ক্রোশ বা দুই ক্রোশ বেড়ান উচিত। ২।৩ জন আত্মীয় একসঙ্গে বেড়াইলে মন প্রফুল্ল থাকে, সুতরাং অধিক শ্রান্তি বোধ হয় না। বেড়াইবার সময়

হস্তদ্বয় ও বক্ষঃস্থল স্থিরভাবে না রাখিয়া, কিয়ৎ পরিমাণে ইতস্ততঃ চালনা করা উচিত। অতি দ্রুতবেগে বেড়াইলে কোন কোন ব্যক্তির পীড়া উপস্থিত হয়। সবল ও সুস্থ শরীরেই দ্রুতগমন ক্লেশকর নহে। যতক্ষণ ক্লেশ বোধ না হয় ততক্ষণ হাঁটিয়া বেড়ান আবশ্যক।

ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইলে শরীরের অনেক অংশের সঞ্চালন হয়। ইহাতে বক্ষঃস্থল প্রসারিত হইয়া ফুস্‌ফুসদ্বয় সবল করে। ইহাতে পটুতা লাভ করিলে অন্যান্য উপকারও আছে।

সাঁতার দেওয়া ও দৌড়ান, অনেক সময়ে পীড়াদায়ক হয়। সন্তরণকালে দেহস্থ রক্ত, মস্তিষ্কাভিমুখে অধিক পরিমাণে ধাবিত হইয়া শিরোরোগ উৎপাদন করে, ও কখন কখন মৃত্যুও উপস্থিত করিয়া থাকে। সন্তরণ শিক্ষা করা সকলেরই উচিত। ইহাতে অনেক বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সন্তরণকালে হস্তপদ ও বক্ষঃস্থল বিলক্ষণ চালিত হয়। দৌড়াইবার সময় রক্তের গতি অতি দ্রুত হয়; তখন বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে হাত দিলেই হৃদয়ের কার্য্যের সত্বরতা অনুভব করা যায়। দৌড়াইলে ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিতে থাকে; তাহা অধিক কাল থাকিয়া গেলে, হৃদয় বা ফুসফুসের রোগ জন্মে ও অবশেষে মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

এতদ্দেশের ও ইংলণ্ডের মল্লগণ নানা প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকেন। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে; কিন্তু

তাহাদের দ্বারা শরীর এরূপ কষ্টকর কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, যে কখন কখন প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে।

নৌকার দাঁড় টানিলে বক্ষঃস্থল ও বাহুদ্বয় ভালরূপে সঞ্চালিত হয়। বন্ধুবর্গ একত্র হইয়া এরূপ করিলে আমোদের সহিত শারীরিক পরিশ্রম হয় বলিয়া ক্লেশবোধ হয় না। যে যে স্থানে নদী, বীল অথবা বড় দিঘী আছে তথায় এই প্রকার ব্যায়াম অনায়াসসাধ্য।

এদেশের বালকেরা শারীরিক পরিশ্রম করিতে ভাল বাসে। যে সকল ব্যায়ামে অনেক দৌড়িতে হয় তাহার দোষগুণ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে বালকেরা অসাবধান হইয়া উৎকট আঘাত প্রাপ্ত হয়। এজন্য শিক্ষক অথবা অন্য কোন বিবেচক লোকের সমক্ষে এই সকল ব্যায়াম করা বিধেয়।

অল্প বয়স হইতে হস্তের পেশীগুলি সর্ব্বদা চালনা করা কর্ত্তব্য। কোন কঠিন দ্রব্যে পুনঃ পুনঃ মুষ্টিপ্রহার করিলে এইটী অভ্যস্ত হয়। ইংরাজেরা ইহাতে বিলক্ষণ পটু। হস্তদ্বয় বলিষ্ঠ হইলে অনেক সময়ে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারা যায়। পদাঘাত শিক্ষা করাও এইরূপ উপকারী।

বন্দুকে গুলিচালনা ও তরবারীচালনা সময়ে সময়ে আত্মরক্ষার একমাত্র সাধন। যে যে প্রদেশে চুরী, ডাকাইতী ও রাহাজানীর ভয় আছে, অথবা যেখানে ব্যাঘ্রাদি

হিংস্র জন্তু বিচরণ করে, সেই সকল স্থানে এই দুইটী নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

এক ক্রমে একভাবে বসিয়া থাকিলে পীড়া হয়। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগকে ৪।৫ ঘণ্টা কাল একরূপে উপবিষ্ট রাখাতে, তাহাদের অঙ্গ সকল উচিত মতে সঞ্চালিত হইতে পারে না, তাহাতে অনিষ্ট ঘটে। শিশুদিগকে ১ ঘটার পরে অন্ততঃ ১০।১৫ মিনিটের জন্য বাহিরে যাইতে দেওয়া উচিত, ও সমুদায়ে ২।৩ ঘন্টার অধিক কাল আবদ্ধ করিয়া রাখা অবিবেচনার কর্ম্ম। অধিক ক্ষণ গৃহে আবদ্ধ রাখিলে, নির্ম্মল বায়ু অভাবে শিশুগণ পীড়িত হইয়া পড়ে। বয়স অনুসারে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কিরূপে পরিশ্রম করাইতে হয়, তদ্বিষয়ে একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের মত নিম্নে সংগৃহীত হইল।

বয়স	নিদ্রা	ব্যায়াম ও বাহিরে কাজকরা	গৃহের অভ্যন্তরে কাজকরা	আহার ও বিশ্রাম
৭।৮	৯	৯	২	৪
৯	৯	৮	৩	
১০	৮	৮	৪	
১১	৮	৭	৫	
১২	৮	৬	৬	
১৩	৮	৫	৭	
১৪	৭	৫	৮	
১৫	৭	৪	৯	

ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে অধিকক্ষণ গৃহে অবরুদ্ধ রাখা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক স্কুলে শিশুগণের পক্ষেও যেরূপ পাঠের সময় নির্দ্ধারিত আছে, ১৫।১৬ বৎসরের ব্যক্তির পক্ষেও সেই নিয়ম। ইহা কেবল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদিগের অনবধানতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে। শিশুকালে কিছু অধিক কাল বাহিরের নির্ম্মল বায়ু সেবন করা আবশ্যক। পূর্ণবয়স্ক লোকেরা প্রত্যহ ৪।৫ ঘন্টাকাল নির্ম্মল বায়ু সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়। এক গৃহে অনেক লোক আবদ্ধ থাকিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসে তথাকার বায়ু দূষিত হইয়া যায়। সেই বায়ু পুনঃ পুনঃ গ্রহণ করিলে শরীরের রক্ত পরিষ্কৃত হইতে পারে না, সুতরাং নানাবিধ রোগ জন্মে। এই বায়ু অধিক দূষিত হইলে, প্রাণনাশক হইয়া উঠে। গান প্রভৃতি আমোদের উদ্দেশে একগৃহে বহুলোক সমাগত হয়, তখন তথাকার বায়ু নিতান্ত অনিষ্টকর। এজন্য তৎপরে অনেকেই অসুস্থ হইয়া পড়েন। অনেক স্কুলেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। এরূপ অনিয়মের প্রতিবিধান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

অষ্টম অধ্যায়।
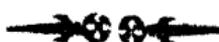
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মানসিক শ্রম।

শরীর রক্ষার জন্য যেরূপ শারীরিক পরিশ্রম করা আবশ্যক, বুদ্ধিশক্তি প্রখর করিবার নিমিত্ত সেইরূপ মানসিক পরিশ্রম আদরনীয়। খাদ্য ও পরিধেয় সংগ্রহ করা আবশ্যক বটে, কিন্তু শুদ্ধ তাহাতে লিপ্ত থাকিলে মনুষ্য ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না। মনুষ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তির আলোচনা করিবার যে ক্ষমতা পাইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাহার উপকরণ তাঁহার শরীরেই বর্ত্তমান আছে। মানবজাতির মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্র যেরূপ উৎকৃষ্ট অন্যান্য জন্তুর সেরূপ নহে। এস্থলে তাহার একটী প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।

(১) মস্তিষ্ক। (২) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক।

(৩) মেরুদণ্ডীয় মজ্জা। শ্বেতরেখা গুলি স্নায়ু।

মস্তিষ্ক ও স্নায়ুযন্ত্র।
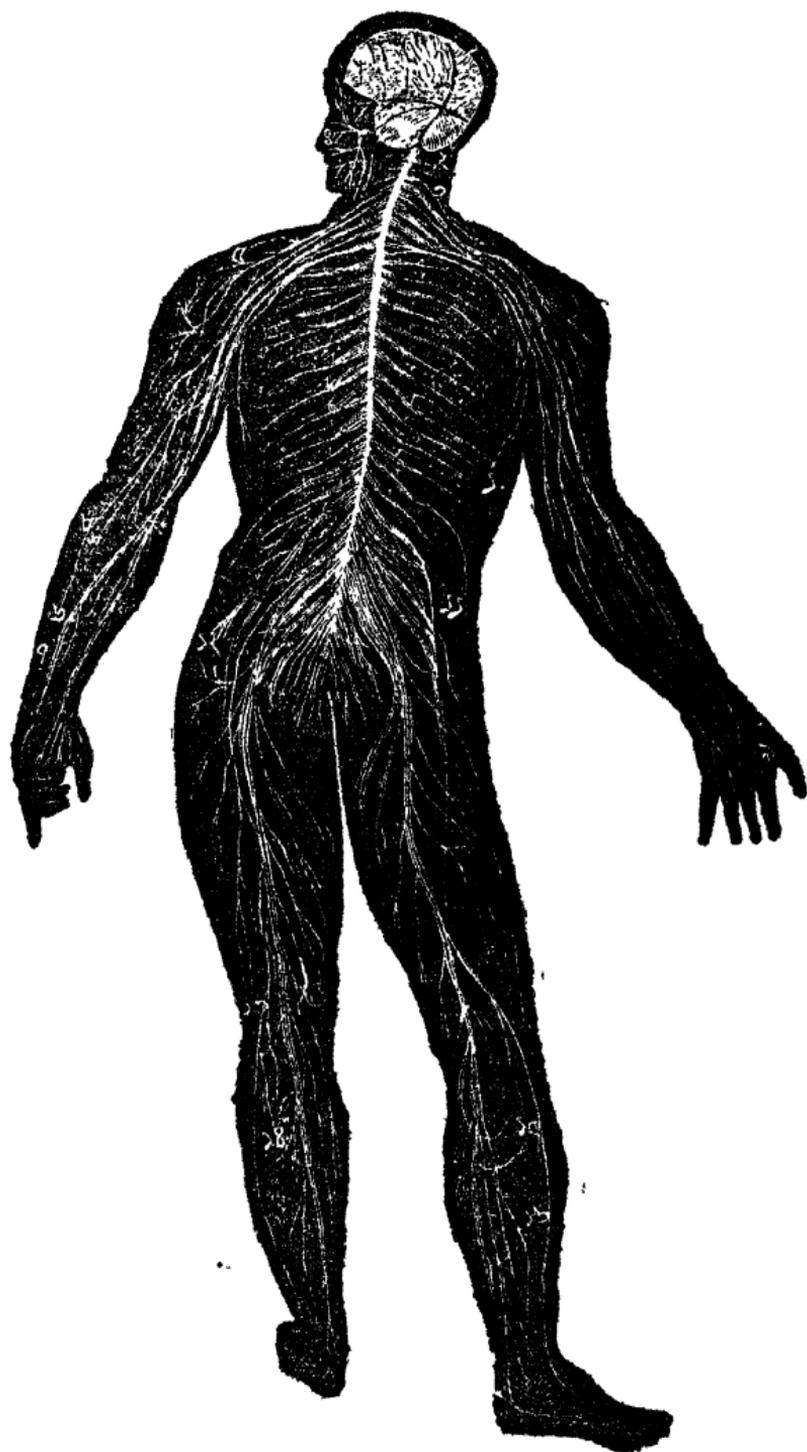
মানসিক পরিশ্রম দ্বারা মনুষ্য নামের যথার্থ গৌরব সাধিত হয়। যে সকল আশ্চর্য্য উপায় উদ্ভাবন করিয়া মানবজাতি পৃথিবীর একমাত্র অধীশ্বর হইয়াছেন, তৎ-সমুদায়ই ইহার দ্বারা সাধিত। মনুষ্যের মানসিক শক্তি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে; ইহার বৃদ্ধির সীমা নির্দ্ধারণ করা যায় না। যে মানসিক পরিশ্রম মনুষ্যের পক্ষে এত উপকারী তাহা হইতে বিমুখ হওয়া সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে।

এতদ্দেশের অনেকেই বিবেচনা করেন পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার সময়ই মানসিক পরিশ্রমের প্রকৃত কাল, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবা-মাত্র আমরা মানসিক পরিশ্রম করিতে আরম্ভ করি, ও মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইয়া তাহা হইতে বিরত হই। এই কালের মধ্যে বিদ্যা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কার্য্য-দক্ষতা লাভ, পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্যের অবধারণ, ইত্যাদি যে সকল বিষয়ে আমরা ব্যাপৃত থাকি তৎসমুদায় মানসিক-শ্রম-সাধ্য। এক্ষণে পৃথিবীর অনেক লোকেই শুদ্ধ শারী-রিক পরিশ্রম করিয়া কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছে। মানসিক শ্রম করিবার প্রবৃত্তি ও অবকাশ অভাবে, তাহা-দিগের বুদ্ধি-শক্তি নিতান্ত হীনাবস্থায় রহিয়াছে। এদে-দেশের স্ত্রীদিগের অবস্থাও এইরূপ। বিদ্যার অভাবে ইহারা ইহলোকের মঙ্গল সাধন ও আপনাদের অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেছে না। অন্যে দয়া করিয়া যাহা

কিছু দান করে, তাহাতেই সন্তুষ্ট রহিয়াছে। কোন কোন লোক, স্বাবলম্বিত ব্যবসায়ের দোষে নিতান্ত নির্ব্বোধ হইয়া পড়ে। যাজনোপজীবী ব্রাহ্মণ, মন্ত্রদাতা গুরু, কোম্পানির কাগজওয়ালা মহাজন, রাজদত্ত বৃত্তিভোগী ব্যক্তি, সামান্য কেরাণী, ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষক প্রভৃতিকে প্রত্যহ একই নিয়মে দিনযাপন করিতে হয়; ইহাদের মনে প্রায়ই কোন অভিনব চিন্তার উদয় হয় না। এই কারণ বশতঃ উক্ত কয়েক শ্রেণীস্থ লোকের মধ্যে, অনেক অল্পবুদ্ধি লোক দেখা যায়।

৩।৪ ঘণ্টা কাল মানসিক পরিশ্রম করিয়া ১ ঘণ্টা কাল বিরাম করা উচিত। ক্রমাগত ১০।১২ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিলে পীড়া উপস্থিত হয়। পাঠাবস্থায় অনেকে রাত্রি জাগরণ করিয়া, একাসনে ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করিয়া নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। অল্পকালের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি ও যশ লাভ করিতে সমুৎসুক হইয়া তাঁহারা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করেন; কিন্তু অভি-লষিত ফল পাইবার পূর্ব্বেই পীড়িত হইয়া পড়েন, অথবা তাহা প্রাপ্ত হইয়াও ভোগ করিতে সমর্থ হন না। যাঁহারা এতদ্দেশীয় গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তন্মধ্যে অনেকেরই এইরূপ ঘটে।

নিয়মিত পরিশ্রম করিলে, কার্য্যসাধন করিতে অধিক সময় লাগিবে, এই আশঙ্কায় যশঃপ্রার্থী লোকেরা দিবা-রাত্র পরিশ্রম করিয়া ৫ বৎসরের কাজ এক বৎসরে সম্পন্ন

করিয়া থাকেন? এরূপ করাতে, হয়ন্ত সঙ্কল্পিত কার্য্য শেষ করিয়া তুলিবার পূর্ব্বেই নিতান্ত রুগ্ন ও অকর্ম্মণ্য হন, অথবা অতি ক্লেশে আকাঙ্ক্ষিত যশ লাভ করেন। কিন্তু ইহাতে হয়ত ৩০।৩৫ বৎসর বয়ঃক্রম না হইতে হই-তেই শরীরে বার্দ্ধক্য ও জরার সমুদায় লক্ষণ উদিত হয়, তখন, তাঁহাদিগের পরিক্লিষ্ট আত্মা, ভগ্নদেহে অবস্থিতি করিতে অসমর্থ হইয়া ত্বরায় পরলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

প্রতি নিয়ত একপ্রকার মানসিক পরিশ্রমে ব্যাপৃত থাকি-লে অন্যবিধ মানসিক শ্রম করিতে পারা যায় না। যাঁহারা কেবল গণিত শাস্ত্র অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন, তাঁহারা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতির রসাস্বাদনে সক্ষম হন না। যাঁহারা শুদ্ধ পুস্তক অধ্যয়ন করিতে ভাল বাসেন, তাঁহারা পুস্তকলব্ধ জ্ঞান কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন না, ও হয়ত সঙ্গীত, চিত্র প্রভৃতি আনন্দদায়ক শাস্ত্র অবহেলা করিয়া থাকেন। পদার্থ-বিজ্ঞান ও সমাজ-বিজ্ঞান সকল শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এই দুই শাস্ত্র শিক্ষার নিমিত্ত আর আর শাস্ত্র পথ-প্রদর্শক মাত্র। অতি অল্প বয়স হইতে আমাদের পদার্থবিষয় অবগত হইবার বাসনা জন্মে। মনুষ্যশরীরের অসীম কৌশল শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে, বস্তুবিচার, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ ও প্রাণী বিদ্যার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কোন্ কোন্ নিয়ম অনু-সারে চলিলে শরীর সুস্থ থাকে, তাহার কতকগুলি অল্প

বয়সে জানা আবশ্যক। ক্রমে বয়োবৃদ্ধি হইলে বিজ্ঞান বিষয়ক অন্যান্য বিষয় শিক্ষা করিতে হয়। যে দেশে বিজ্ঞান শাস্ত্রের পর্য্যালোচনা হয়, সেই দেশই অল্প দিনের মধ্যে সভ্যতার উচ্চ সীমা প্রাপ্ত হয়। এবিষয়ে আমাদের দেশের নিতান্ত হীন অবস্থা। কেবল শব্দশিক্ষা এদেশে আজিও বিরাজমান রহিয়াছে।

বিদ্যাশিক্ষা মনোভিনিবেশ ব্যতিরেকে হয় না। যাহারা এক মনে পাঠের বিষয় চিন্তা না করে তাহারা কখনই সুশিক্ষিত হইতে পারে না। পড়িবার কালে একবার এ পুস্তক একবার ও পুস্তক খানি খুলিলে, কোন বিষয়েই মনোযোগ হয় না। শরীর যখন নিতান্ত ক্লান্ত থাকে অথবা যৎকালে নিদ্রার আবির্ভাব হয়, তখন পড়িতে গেলে পাঠ্যবিষয় বোধগম্য হয় না, শরীরও পীড়িত হইয়া পড়ে।

অধ্যয়ন করিবার সময় যেরূপ একাগ্রতার প্রয়োজন, একাসনের অধিক কাল পড়িতে গেলে তাহা থাকে না। যদি প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া এরূপ কার্য্যে অধিক সময় অতি-পাত করা যায়, তাহা হইলে মস্তিষ্কের পীড়া জন্মে। অনেকে অল্প সময়ে অধিক বিদ্যা অর্জ্জন করিবার অভি-লাষে পীড়িত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কেহ কেহ আবার শারীরিক পরিশ্রম এককালে বিসর্জ্জন দেন, তাহা-তেও নানাবিধ রোগ জন্মে। রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়ার ত কথাই নাই; দিবসেও একক্রমে অধিক ক্ষণ

পড়া নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে আহার করিবার পরে পাঠ অভ্যাস করিয়া এদেশের অনেকে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এরূপ করা নিতান্ত অবিবেচনার কর্ম্ম। অল্প বয়সে যশ পাওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তাহা করিয়া চির দিনের জন্য রোগ ভোগ করা আবার অধিক পরিমাণে ক্লেশকর। বিদ্যালয়ের কাল ব্যতীত বাটীতে ৪।৫ঘন্টা কাল একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিলেই চলিতে পারে। প্রত্যূষে উঠিয়া স্নানাদি সমাপন করিয়া কিছুকাল বেড়াইবার পরে, ২ ঘন্টা কাল পড়া চলিতে পারে, ও বৈকালে ১ ঘন্টা ও সন্ধ্যার পরে ২ ঘন্টা পড়িলেই যথেষ্ট হয়। বার মাস এই নিয়ম পালন করিয়া পড়িলে, আর রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় না। যাঁহারা বৎসরের প্রথমে পাঠে উপেক্ষা করেন, তাঁহাদিগকেই পরীক্ষার কিছুদিন পূর্ব্বে রাত্রি জাগরণ করিতে হয়।

নবম অধ্যায়।

নিদ্রা।

নিয়ত পরিশ্রম করিলে শারীরিক যন্ত্র সকল দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, এজন্য তাহাদের বিশ্রামকাল নির্দ্দিষ্ট আছে। ক্রমাগত ১০।১২ ঘন্টা পরিশ্রম করিতে করিতে প্রথমতঃ শরীর অবসন্ন হয়, ইতস্ততঃ গমনাগমনে

অনিচ্ছা হয়, ইন্দ্রিয়গণ অবশ হইয়া আসে, ও অবশেষে মনোবৃত্তি সকল নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে। তখন শ্রান্তিহারিণী নিদ্রা উপস্থিত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হরণ করিয়া ফেলে। পরিশ্রান্ত ও শোকতাপাকুলিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে, নিদ্রা যেরূপ মহোপকারিণী তাহা অনেকেই দেখিয়াছেন। ফলতঃ নিদ্রা না হইলে নানা রোগ ও অচিরাৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নিদ্রা হইতে উঠিলে পূর্ব্ব দিনের পরিশ্রমজনিত ক্লেশ আর কিছুই থাকে না।

রাত্রি নিদ্রার প্রকৃত সময়। দিবসে নানা প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর ক্লান্ত হইলে নির্ব্বিঘ্নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়। যাহারা শ্রমবিমুখ, তাহারা বহু ব্যয় করিয়াও সুনিদ্রা রূপ অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হইতে পারে না। কেহ কেহ আবার এরূপ দুর্ভাগ্য যে দিবাভাগ নিদ্রায় অতিপাতিত করে, ও রাত্রিকালে নিতান্ত অস্থির হইয়া নানা প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক নিদ্রাকে আহ্বান করে; কিন্তু এরূপ লোকের কখনই সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনা নাই।

শরীর সুস্থ না থাকিলে সুনিদ্রা হয় না। তখন নানা প্রকার স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া ক্লেশদায়ক হইয়া উঠে। অজীর্ণ দোষ নিদ্রার বিশেষ প্রতিবন্ধক; এজন্য নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে গুরুতর ভোজন করা অন্যায়।

যাহারা মানসিক পরিশ্রম করিতে করিতে শরীর

অসুস্থ করে তাহাদের সহজে নিদ্রা হয় না। শয়নের কিছুকাল পূর্ব্বে ব্যায়াম করা ইহাদের কর্ত্তব্য। ইহারা সন্ধ্যার পর নিশ্চিন্ত মনে স্থিরভাবে না থাকিলে, নিদ্রার মুখদর্শন করিতে পারে না।

নিদ্রাকর্ষণ হইবামাত্র শয়ন করা আবশ্যক। যাহাতে মন প্রফুল্ল থাকে, এবং মস্তিষ্ক অস্থির না হয়, এরূপ আমোদ প্রমোদ করিলে সুনিদ্রা হইতে পারে। আত্মীয়-গণের সহিত বাক্যালাপ, শিশুগণের আমোদ প্রমোদে উৎসাহ দান, সুখপ্রদ পুস্তকাদি পাঠ প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে।

শয়নের পূর্ব্বে ক্রোধ, দ্বেষ, বিরক্তি প্রভৃতি ক্লেশকর ভাবের উদয় হইলে নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মে, এজন্য তৎ-সমুদায় পরিত্যাগ করা উচিত। তৎকালে আমোদ প্রমোদ করিয়া কৃতজ্ঞচিত্তে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রাভিভূত হইলে যেরূপ সুখী হওয়া যায় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। কোন একটী বিষয়ে মনোনিবেশ করিলে শীঘ্র নিদ্রা হয়। অনেকে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে নিদ্রিত হন তাহার কারণই একা-গ্রতা। অন্ধকারে নিদ্রার সুবিধা হয়। এজন্য শয়নের পূর্ব্বে প্রদীপ নির্ব্বাণ করা আবশ্যক।

শয়নের পূর্ব্বে হস্তপদ ও মুখ প্রক্ষালন করিয়া, তোয়ালে বা মোটা কাপড় দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা উচিত। তখন ফ্লানেল প্রভৃতি কাপড় পরিত্যাগ পূর্ব্বক

যে পরিমাণে কার্পাসের কাপড় ব্যবহার করিলে শীত নিবারণ হয়, তাহা দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন করা বিধেয়।

আমাদের শয্যা নিতান্ত কঠিন বা কোমল হইলে নানা প্রকার দোষ ঘটে। শিশুদিগের শয্যা অপেক্ষাকৃত কোমল হওয়া আবশ্যক।

আহারের অব্যবহিত পরে শয়ন করিতে হইলে ১২ বা ২ ঘন্টা কাল বামপার্শ্বে ও পরে দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করা উচিত। চিত হইয়া শয়ন করিলে মেরুদণ্ড ক্লিষ্ট হয় ও বক্ষঃস্থলে দুর্ব্বহ ভার বোধ হয়, তাহাতে নানা প্রকার ভয়ানক স্বপ্ন উপস্থিত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেয়। ইহাকেই লোকে " মুখ-চাপা " বলে। রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হওয়াতে ও মেরুদণ্ডের স্নায়ুতে আঘাত লাগাতে এই ক্লেশকর পীড়া উপস্থিত হয়, এবং ইহাতে কোন কোন ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়া থাকে।

শয়নকালে গাত্রাবরণ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য বটে; কিন্তু তাহা অতিরিক্ত পরিমাণে ধারণ করিলে শরীর উত্তপ্ত হয়, এবং ঘর্ম্ম-নিঃসরণ হওয়াতে নিদ্রার ব্যাঘাত করিয়া ফেলে। নিদ্রাকালে গাত্রবস্ত্র দ্বারা মুখ নাসিকাদি আবৃত রাখা অন্যায়। এরূপ করিলে, পুনঃ পুনঃ প্রশ্বাসিত দূষিত-বাষ্প গ্রহণ করিতে হয়; তাহাতে পীড়া ও অকাল মৃত্যু হইতে পারে।

শয়নগৃহে বায়ু-সঞ্চালনের বিশেষ পথ রাখা উচিত। কেহ কেহ রাত্রিকালের বায়ুকে এত ভয় করেন, যে তাহ

কোন মতেই গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার উপায় নির্দ্ধারণে নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন। এমন কি, জানালা ও দ্বারের সন্ধিস্থানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলেও, তাহা তূলা বা ছিন্নবস্ত্র দ্বারা রোধ করিয়া থাকেন। ইহাতে এত সশঙ্ক হইবার প্রয়োজন নাই। এরূপ করিলে বায়ু গমনাগমনের পথ রোধ করা হয় এই মাত্র। যেখানে শয়ন করা হয় তাহার ঠিক সম্মুখের জানালা ও দ্বার খুলিয়া রাখিয়া নিদ্রা গেলে পীড়া হয়।

এদেশে শীতকালে ৭।৮ ঘন্টা ও গ্রীষ্মকালে ৬।৭ ঘন্টা নিদ্রা গেলেই যথেষ্ট হয়। শিশু ও রোগীদিগের পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক সময়ের প্রয়োজন। অভ্যাসানুসারে নিদ্রার সময় নির্দ্ধারণ করা উচিত। কেহ কেহ আহার করিবা মাত্র নিদ্রাকৃষ্ট হন, অন্য কেহ কিয়ৎকাল পরে নিদ্রা যাইয়া থাকেন। গ্রীষ্মকালে ১০ টা ও শীতকালে ৯½ টার সময় শয়ন করিয়া, প্রত্যূষে উঠিলেই যথেষ্ট হয়। নিদ্রাভঙ্গ হইলে, শয্যায় থাকিয়া পুনরায় নিদ্রা যাইবার চেষ্টা করা অন্যায়; ইহাতে অনিষ্ট ঘটে।

এক গৃহে অনেকে শয়ন করিলে নানা প্রকার অসুখ হয়, হয় ত অধিক লোকের নিশ্বাস প্রশ্বাসে গৃহের বায়ু দূষিত হয়। সেই বায়ু দূরীকৃত হইতে না পারিলে নানা রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। এক বিছানায় অনেকে শয়ন

করা আরও দোষাকর। যাহার যেমন অবস্থা হউক না কেন, এ বিষয়ে অবহেলা করা নিতান্ত অন্যায়।

ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকে নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ অভ্যাস করিয়া থাকেন। অষ্টম অধ্যায়ে ইহার দোষ বর্ণিত হইয়াছে। এরূপ করিয়া অনেকে চিররোগী হন, কেহ কেহ বা অল্প বয়সেই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন। যাঁহারা দিনমানে রীতিমত অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদের পক্ষে রাত্রি জাগরণের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। অনেকে দিবাভাগ বৃথা আমোদে বা আলস্যে অতিপাতিত করিয়া রাত্রিকালে পড়িতে বসেন, এরূপ করা আরও অবিবেচনার কর্ম্ম।

দশম অধ্যায়।

মনোবৃত্তি।

শরীর ও মনের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ তাহা এই পুস্তকের স্থানে স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শরীর রুগ্ন হইলে মনোবৃত্তি সকল বিকৃত হইয়া যায়, ও মানসিক কষ্ট হইলে শরীর অসুস্থ হয়, ইহা অনেকেই অনুভব করিয়াছেন। ক্ষুধাকালে ক্রোধ, শোক প্রভৃতির উদয় হইলে তৎক্ষণাৎ ক্ষুধা অন্তর্হিত হয়। কেহ কেহ প্রবল চিন্তাবেগে ২।৩ দিন অনাহারে থাকেন।

মনোবৃত্তি সকল সর্ব্বদা উত্তেজিত হইলে স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়; অতএব যাহাতে মনে কোন উপদ্রব না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। দেখা গিয়াছে যাহারা সর্ব্বদা রাগ দ্বেষাদির বশীভূত, তাহারা দীর্ঘজীবী হয় না।

যাঁহারা সর্ব্বদা প্রসন্ন ও প্রফুল্ল মনে থাকেন তাঁহারা অধিক পরিশ্রম করিয়াও ক্লান্ত হন না। ভোজনকালে আমোদ প্রমোদ করিলে, অতি শীঘ্র পরিপাক ক্রিয়া নির্ব্বাহ হয়।

মনুষ্যদিগের নানা প্রকার নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি আছে। তৎসমুদায় প্রয়োজনীয় বটে, কিন্তু তাহাদিগের বশীভূত হইলে পশুতুল্য হইতে হয়। এই সকল বৃত্তি প্রবল হইলে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার শক্তিরই হ্রাস হয়, ও পরিশেষে রোগপরম্পরা উপস্থিত হইয়া প্রাণ সংহার করে।

মনোবৃত্তির কার্য্যানুসারে লোকে দীর্ঘায়ু বা অল্পায়ু হইয়া থাকে, এক্ষণে তাহা এক প্রকার স্থিরীকৃত হইয়াছে। যে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অতিরিক্ত চিন্তা ও শারীরিক অত্যাচার করিতে হয়, তাহাতে লিপ্ত হইলে দীর্ঘজীবী হওয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন হইয়া উঠে। ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে প্রসিয়ার অন্তর্গত বর্লিন নগরে ব্যবসায়ানুরূপ লোকসংখ্যা স্থির করিয়া তাহাদের মধ্যে কতলোক ৭০ বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল তাহা নির্ণীত হয়।

নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল।

১০০	যাজকের মধ্যে ..	৪২ জন
,, ,,	কৃষিব্যবসায়ী	৪০
,, ,,	বাণিজ্য ব্যবসায়ী ...	৩৫
,, ,,	সৈনিক	৩৩
,, ,,	ব্যবহারাজীব	২৯
,, ,,	চিত্রকর, ভাস্কর ইত্যাদি	২৮
,, ,,	শিক্ষক	২৭
,, ,,	চিকিৎসক	২৪

এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে বোধ হইবে যে চিকিৎসকের ব্যবসায় যেরূপ চিন্তা ও অনিয়মের অধীন তেমন আর কিছুই নাই। কি দিবা কি রাত্রি যখন কেহ রোগাক্রান্ত হয়, অমনি চিকিৎসককে তথায় উপস্থিত হইতে হয়। স্বয়ং বহুকাল নিদ্রা বিসর্জ্জন দিয়া বা অনাহারে থাকিয়া, অন্যের ক্লেশ শান্তির জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতে হয়, এবং কি উপায়ে পীড়িত ব্যক্তি শীঘ্র রোগমুক্ত হইবে অথবা জীবনদান পাইবে তাহা ভাবিতে ভাবিতে অস্থির হইতে হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অবস্থা, তাহাতে রোগ নির্ণয় করা বা যথার্থ ঔষধ প্রয়োগ করা অশেষচিন্তাসাধ্য। আর সকলকে দীর্ঘজীবী করিবার জন্য, চিকিৎসককে অন্যান্য সমুদায় লোক অপেক্ষা অল্পকাল বাঁচিতে হয়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার শারীরিক নিয়ম উপেক্ষাও করিয়া থাকেন।

অনায়াসে আরোগ্য হইবার উপায় আছে ভাবিয়া সামান্য অনিয়ম গ্রাহ্য করেন না কিন্তু পরিণামে তাহাতে অনেক অনিষ্টাপাত হয়।

শিক্ষকেরা প্রায় চিকিৎসকদিগের ন্যায় অল্পায়ু। ইহাদের মর্য্যাদা ও ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাকৃত ন্যূন, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে শিক্ষকের ব্যবসায় সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিজনক ও প্রাণনাশক জ্ঞান করিতে হইবেক।

সামান্য যাজক ও কৃষক সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল বাঁচিতে পারে, কারণ তাহাদের মানসিক ক্লেশ ও দুর্ভাবনা প্রায়ই নাই। তাহারা প্রতিনিয়ত একই নিয়মে কার্য্য করিতে পারে, ও তাহাদিগকে অন্যের অনুরোধে শরীর বা মনকে বিচলিত করিতে হয় না। অন্যান্য ব্যবসায়ের বিষয় যাহা লেখা হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলেও প্রকৃত কারণ সকল অনুভূত হইবে যে। শ্রেণীস্থ লোকের মনোবৃত্তি অনুক্ষণ জটিল পথে চালিত হয়, তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক ব্যক্তি অল্পকালে কালগ্রাসে পতিত হইবেন তাহার আর সন্দেহ কি। মানসিক পরিশ্রমে স্নায়ু-যন্ত্র ও মস্তিষ্ক ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পেশী সকল যেমন অল্প বিশ্রামের পরই পুনরায় কার্য্যক্ষম হয়, স্নায়ু সকল সেরূপ ক্লান্ত হইলে, তদপেক্ষা অধিককাল বিশ্রাম না করিলে সবল হয় না। নিয়মিত বিশ্রাম না পাইলে স্নায়ুযন্ত্র ক্ষীণ হইয়া পড়ে, তাহাতে সকল প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ পরম্পরা উপস্থিত হয়।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে, যাহারা স্বভাবতঃ ক্ষীণ বা দুর্ব্বল অথবা সামান্য কারণে পীড়িত হয়, তাহাদের পক্ষ চিকিৎসা বা অধ্যাপনা কার্য্য ভয়ানক অনিষ্টকর ; এরূপ ব্যক্তিরা প্রথমতই যাজন বা কর্ষণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইলে অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় ও দীর্ঘজীবী হইতে পারে। যাহাদের শরীর ও মন সবল তাহারাও আইন, চিকিৎসা বা আধ্যাপনা অবলম্বন করিলে পীড়িত হইবার সম্ভাবনা, অতএব এ সকল ব্যবসায়ে থাকিলে অধিকতর সতর্কতার আবশ্যক করে।

সভ্যতার বৃদ্ধি সহকারে পৃথিবীতে অভিনব রোগপরম্পরা দৃষ্ট হইতেছে, এবং অসভ্যাবস্থার কোন কোন রোগ বিরল বা অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু যত দিন লোকে ব্যবসায় বা ক্ষণিক সুখের অনুরোধে, অলঙ্ঘ্য নিয়ম সকল অবহেলা করিবে, তত কাল পৃথিবী রোগ-শোক-শূন্য বিমল আনন্দধাম হইবে এরূপ ভরসা করা যায় না। কখনই যে এরূপ সুখের সময় উপস্থিত হইবে, মানবজাতির পূর্ব্ববৃত্তান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাহা বোধ হয় না।

পরিশিষ্ট।

খাদ্যের পুষ্টিকারিতা।

প্রসিদ্ধ রসায়নশাস্ত্র-বেত্তা লীবিগ্‌ মহোদয় কতিপয় খাদ্য দ্রব্যের আপেক্ষিক পুষ্টিকারিতা গুণ তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী দ্রব্যের বিষয় উদ্ধৃত করা গেল। ইহার মধ্যে কোন কোনটীর পরিপাককালও লিখিত হইল।

খাদ্য	পুষ্টিকারিতা।	পরিপাক কাল।
মাতৃ স্তন্য	১০০ ...	... ২ ঘণ্টা
সাগু	... ...	১¾ ,,
সিদ্ধ চাউল	৮১ ..	... ১ ,,
যব	১২ ...	... ২ ,,
সিদ্ধ দুধ	১৩৭ ...	.. ২ ,,
সিদ্ধ আলু	৮৪ ...	..৩½ ,,
ঘৃত	... ..	..৩½ ,,
ডিম	১১৫০ ..	... ২ হইতে ৩½ ,,
মেষমাংস	৮৫২	..৩½ ,,
বিলাতী রুটী ...	১৪২	...৩½ ,,
গম	১১৯ হইতে ১৪৪	,, ,,
বাছুর বৎসা ...	৫২৮	...,, ,,
ভুট্টা	১০০ হইতে ১২৫	,, ,,
শালগম	১০৬	৩½ ,,
মটর	২৩৯	,, ,,
কাঁকড়া	৮৫৯	,, ,,

মাতৃ-স্তন্যকে আদর্শ ধরিয়া অন্যান্য দ্রব্যের পুষ্টি-কারিতা নির্ণীত হইল।

ডাক্তার লীবিগ্ খাদ্যের যবক্ষারজান-বিশিষ্ট অংশ-কেই পুষ্টিকারী বিবেচনা করেন। তাঁহার মতে অপরাপর উপাদান সকল দেহ-নির্ম্মাণ-কার্য্যে লাগে না। কিন্তু এক্ষণে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা এ মতের সম্পূর্ণ অনু-মোদন করেন না। যাহা হউক লীবিগ্ যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিতান্ত অমূলক নহে।

খাদ্যদ্রব্য পুষ্টিকারী হইলেই যে উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে এমত নহে। অভ্যাস ও শারীরিক অবস্থা ভেদে কোন কোন দ্রব্যের উপকারিতা বা অপ-কারিতা প্রকাশ পাইয়া উঠে। কেহ কেহ মাংস খাইলে অসুস্থ হন, কেহ বা দুগ্ধ ঘৃত প্রভৃতি খাদ্য খাইতে নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। অতএব রাসায়নশাস্ত্রের কথার উপরি নির্ভর করা যায় না। পাকযন্ত্রে উপস্থিত হইয়া কোন্ দ্রব্য কিরূপ কার্য্যকারী হইবে তাহা প্রত্যেক ব্যক্তির অভ্যাস দ্বারাই জানা যায়।

কয়েকটী দ্রব্য কখনই শরীরের কার্য্যে লাগে না, উদ-রস্থ হইলে অপরিবর্ত্তিত ভাবে বহির্গত হইয়া যায়। মৎস্যের আঁইস, শাক ও ফলের হরিদংশ, পেয়ারা প্রভৃ-তির বীজ, অস্থি ও ডাইল প্রভৃতির খোসা এই শ্রেণীভুক্ত। যাহাদের উদরাময় আছে তাহাদের পক্ষে এ সমস্ত দ্রব্য বিশেষ অনিষ্টকারী।

সাধারণ নিয়ম।

১। প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিবে। উঠিবা মাত্র মুখ প্রক্ষালন করিবে, ও ত্বরায় মলত্যাগ করিবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে মলত্যাগ অভ্যাস করা উচিত। তৎপরে কয়-লার গুড়া দিয়া দন্ত পরিষ্কৃত করিবে। তাহাতে মুখের দুর্গন্ধ যায়। তামাকের গুলের গুড়াও ভাল। পীড়া কালে লবণ দিয়া মুখ ধুইলে ভাল হয়।

২। মুখ ধুইয়া তৎপরে শীতল জলে স্নান করিবে। স্নানের পরে শুষ্ক কাপড় দিয়া গাত্র মার্জ্জনা করিবে। স্নানের পর সরবত্ পান করিবে, অথবা ক্ষুধা অনুসারে অন্য কোন দ্রব্য খাইবে। স্নানান্তে অথবা অন্য কোন সময়ে আর্দ্র বস্ত্র ব্যবহার করিবে না।

৩। নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রফুল্লচিত্তে অনন্যমনে ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া আহার করিবে। অপরিমিত আহার করিবে না। উদরের পীড়া থাকিলে তৎকালে জল পান না করিয়া ২।৩ ঘন্টা পরে জল পান করিবে। যে যে দ্রব্য খাইলে কষ্ট হয় তাহা কখনই খাইবে না। আহারের পরে সুন্দর রূপে আচমন করিবে। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম না করিয়া অন্য কর্ম্ম করিবে না।

৪। পানীয় দ্রব্যের মধ্যে শীতল জল, দুধ, চিনি বা মিছরির সরবৎ, অথবা লেবু, দালিম প্রভৃতি ঈষদম্ল

ফলের রস, গ্রহণ করিবে। কোন মতে মাদক দ্রব্য সেবন করিবে না।

৫। ঘর্ম্ম নির্গমন আরম্ভ হইলে অথবা শ্রমের পর শরীর উত্তপ্ত হইলে, গায়ে শীতল বাতাস লাগাইবে না। এ সময়ে শীতল জল পান অথবা শীতল জলে স্নান নিষিদ্ধ। শীতল বায়ুতে শয়ন ও উপবেশন করিবে না। প্রত্যহ ৩।৪ ঘন্টা কাল নির্ম্মল বায়ু সেবন করিবে, কিন্তু বৃষ্টির সময় অথবা শীতকালের রজনীতে গায়ে বাতাস লাগিতে দিবে না।

৬। শয্যা হইতে উঠিবা মাত্র গৃহের দ্বারাদি খুলিয়া দিবে, ও দিবসে গৃহের অভ্যন্তরে সুন্দর রূপে বায়ু গমনাগমনের সুবিধা করিয়া রাখিবে। শয্যাগৃহ অদ্য শীতল কল্য উত্তপ্ত হইলে পীড়া হয়।

৭। ঋতুর প্রকৃতি অনুসারে গাত্র-বস্ত্র ব্যবহার করিবে। শীতকালের কাপড় মোটা হওয়া আবশ্যক। শীতের অব্যবহিত পূর্ব্বেই শীতবস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ করিবে, ও শীত অবসান হইলেও যতদিন ভাল করিয়া গ্রীষ্মের আবির্ভাব না হয়, তত দিন, তাহা ত্যাগ করিবে না।

৮। প্রত্যহ নিয়মিত পরিশ্রম করিবে, ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিদ্রা যাইবে। শীতকালে ৭।৮ ঘন্টা ও গ্রীষ্ম কালে ৬।৭ ঘন্টা যথেষ্ট। শিশু ও রোগীদিগের অধিক নিদ্রার প্রয়োজন।

৯। পচা বা দুর্গন্ধময় দ্রব্য বাসস্থানের নিকটে রাখিবে

না। বাসস্থানের নিকটে অনেক বৃক্ষ থাকা ভাল নহে। শুষ্ক ও উন্নতস্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।

১০। শরীর ও পরিধান বস্ত্রাদি সতত পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে। পীড়াকালে বস্ত্রাদি বারম্বার পরিত্যাগ করিবে।

১১। অধ্যয়নের অনুরোধে ব্যায়াম ও নিদ্রা পরিহার করিবে না। রাত্রি জাগরণ করিলে শরীর অকর্ম্মণ্য হয়, ও বুদ্ধি-শক্তি প্রখর থাকে না।

১২। মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে, অন্য কর্ম্মের অনুরোধে তাহা হইতে বিরত থাকিবে না। তাহা হইলে নানা রোগের সূত্রপাত হয়।

১৩। নিয়মিত সময়ে সহজে পরিপাক করা যায় এইরূপে আহার করিবে। আহারান্তে উত্তম রূপে মুখ প্রক্ষালন করিবে। দাঁতন করা ভাল বটে, কিন্তু খড়িকা খাওয়া ভাল নহে।

১৪। প্রত্যহ আবশ্যকমত ব্যায়াম ও বায়ু সেবন করিবে। কিন্তু বায়ু প্রবাহে নিদ্রিত হইবে না।

অপ্রচলিত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ।

অঙ্গার—Carbon

অণুবীক্ষণ—Microscope

অন্ননালী—Æsophagus

অম্লজান—Oxygen

আপেক্ষিক পুষ্টিকারিতা গুণ—Relative nutritive value

আমাশয়—Stomach

ইচ্ছানুগ পেশী—Voluntary muscle

এমোনিয়া—Ammonia

উদজান—Hydrogen
উপধাতু—Metalloids
উপাদান—Constituent of which any thing is made
উপাস্থি—Cartilage
কৈশিকা—Capillary
ক্লোম—Pancreas
কার্বোলিক এসিড—Carbolic Acid
জলীয় বাষ্প—Aequeous vapor
তাপ উদ্ভাবন—Production of heat
দ্রাবক—Solvent
দ্ব্যম্ল অঙ্গারক বাষ্প—Carbonic acid gas
ধমনী—Artery
পনিরময় পদার্থ—Caseine
পরমাণু—Atom
পাকযন্ত্র—Digestive apparatus
পিত্তরস—Bile
পিত্তকোষ—Gall-bladder
প্লীহা—Spleen
পেশী—Muscle
ফুস্ফুস্—Lungs
বায়ুকোষ—Air-cells of the lungs
বায়ু প্রবেশ—Trachea
বায়ু সঞ্চালন—Ventilation
বৃহৎ অন্ত্র—Large intestine
ভৌতিক বা রূঢ় পদার্থ—Elementary substance
মলনির্গম—Rectum
মস্তিষ্ক—Brain
মূত্রাশয়—Bladder

মেরু দণ্ডীয় মজ্জা—Spinal marrow
মেরুদণ্ডের স্নায়ু রজ্জু—Spinal cord
যকৃৎ—Liver
যবক্ষারজান—Nitrogen
যবক্ষারজান-বিশিষ্ট—Nitrogenous
যবক্ষারজান-বিহীন—Non-nitrogenous
রসায়ন শাস্ত্র—Chemistry
রক্ত সঞ্চালন—Circulation of the blood
লালা—Saliva
শরীরের গ্রন্থি—Joints of the body
শারীর ক্রিয়া—Physiological functions
শিরা—Veins
শীতল-রক্ত-বিশিষ্ট জীব—Cold-blooded animals
শ্বেতসার—Starch
সরীসৃপ—Reptiles
সংক্রামক রোগ—Contagious disease
স্তন্যপায়ী জীব—Mammalia
স্বৈর পেশী—Involuntary muscle
স্নায়ু—Nerve
হরিদংশ—Green part of vegetables
হৃদয়—Heart
হৃদয় কোটর—Cavity of the heart
ক্ষুদ্র-অন্ত্র—Small intestine
ক্ষুদ্র-মস্তিষ্ক—Cerebellum

সমাপ্ত।